দেশ বিদেশের
বিজ্ঞানী
অমরনাথ রায়

দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী

দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী

অমরনাথ রায়
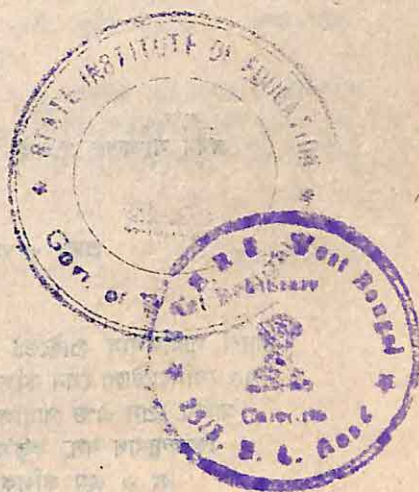
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৭৫ চতুর্থ মুদ্রণ জুন ১৯৮১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ অসিত পাল

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১২·০০

লেখকের নিবেদন

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে, ছোটরা অনেকেই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে কম খোঁজ-খবর রাখে। অথচ এই বিজ্ঞানের যুগে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বিজ্ঞানীদের জীবনী পড়া একান্ত প্রয়োজন। তাতে তারা বিজ্ঞান-চর্চায় অনুপ্রেরণা পাবে এবং নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে মহান বিজ্ঞানীদের আদর্শে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই রচনা করেছি এ গ্রন্থ—"দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী"।

দেশ-বিদেশের কিছু সংখ্যক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের কথা আপাততঃ এ বইতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভবিষ্যতে পরিবর্ধিত সংস্করণে তাঁদের কথা বলবার ইচ্ছা রইলো।

অমরনাথ রায়

রায়বাড়ী,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
জুলাই, ১৯৭৫

সূচীপত্র

হিপোক্রেটাস

[খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৪৬০—৩৭০]

আজ থেকে বহুকাল আগে—যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবারও চারশো ষাট বছর আগে, ঈজিয়ান সাগরের বুকে 'কস' দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'হিপোক্রেটাস'। হিপোক্রেটাস কে ছিলেন তা জানো তো? তাঁকে বলা হতো 'চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক'।

হিপোক্রেটাসের পিতা ছিলেন চিকিৎসক। পিতার কাজকর্ম দেখে পুত্রও ছেলেবেলাতেই চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। আর লেখাপড়ায় ছেলের গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে পিতাও সেকালের সেরা জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের কাছে ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন।

সেকালে ডিমোক্রিটাস নামে এক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ইনি প্রকৃতি-বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র ও চারুশিল্পে প্রগাঢ় বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। আর এহেন পণ্ডিত ব্যক্তির কাছেই হিপোক্রেটাসের উচ্চশিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। শিক্ষাগুরুর মত হিপোক্রেটাসও প্রাচীন পৃথিবীর বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে-ছিলেন। এথেন্স নগরীতে গিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা ও অধ্যাপনা করেছিলেন।

তখনকার দিনে গ্রীস দেশে শব-ব্যবচ্ছেদ করা নিষিদ্ধ ছিল। সেই কারণে সেকালের চিকিৎসকেরা শারীর বিদ্যা ও রোগ নিরূপণ বিদ্যায়

তেমন পারদর্শী ছিলেন না। তবুও ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগানো ও সরে যাওয়া হাড় ঠিকমত বসানো সম্পর্কে হিপোক্রেটাসের প্রবন্ধগুলি পড়লে বোঝা যায় যে, অস্থি, অস্থি-সংযোজক ঝিল্লী এবং মাংসপেশীর গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। শব-ব্যবচ্ছেদ করার সুযোগ না পেয়েও কি ভাবে এ জ্ঞান তিনি আহরণ করেছিলেন, আজকের দিনে তা ভাববার বিষয়। ভাঙ্গা হাড়কে জুড়বার জন্য পাতলা কাঠ—কোথায় কি ভাবে স্থাপন করতে হবে, তার ওপরে কি ভাবে পটি বাঁধতে হবে—সে-সবেরও উল্লেখ করে গেছেন হিপোক্রেটাস। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে-সব পদ্ধতি এ কালের আধুনিক পদ্ধতিরই অনুরূপ। ক্ষত চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্পর্কেও অনেক সুন্দর সুন্দর নির্দেশ দিয়ে গেছেন হিপোক্রেটাস তাঁর বইতে। সেই সব নির্দেশ এতই বাস্তবধর্মী যে পড়লেই বোঝা যায়, বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই হিপোক্রেটাস তাঁর জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। অস্ত্রোপচারের ঘর কেমন হওয়া উচিত, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি কিভাবে প্রস্তুত করা উচিত, অস্ত্রোপচারের পর কেমন ভাবে ক্ষতস্থানের যত্ন নেওয়া উচিত—সে-সবেরও নির্দেশ দিয়ে গেছেন এই মানুষটি। শুধু কি তাই! রোগীর পথ্য, পরিচর্যা প্রভৃতি বিষয়েও অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গেছেন হিপোক্রেটাস।

হিপোক্রেটাস বলতেন: চিকিৎসককে রোগীর পারিবারিক ইতিহাস, তার পেশা, দৈনন্দিন কাজকর্ম, তার পরিবেশ, তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা খুব ভালভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। তবেই তিনি সঠিকভাবে রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারবেন।

এতদিন পর্যন্ত সন্ন্যাস বা মৃগী রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের ধারণা ছিল অদ্ভুত। অজ্ঞ সাধারণ মানুষের মত তাঁরাও ভাবতেন যে, ঈশ্বর রুষ্ট হলে অথবা ভূতে ভর করলে তবেই মানুষের এ রোগ হয়। তাই এ রোগটি এত ভয়াবহ ও মারাত্মক। এ রোগ হলে আর সারে না। হিপোক্রেটাস অজ্ঞ চিকিৎসক ও সাধারণ মানুষের এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—রোগ, তা যতই ভয়াবহ ও মারাত্মক হোক না কেন, তার সঙ্গত কোনো প্রাকৃতিক কারণ থাকবেই। অনুসন্ধান বা গবেষণা করে চিকিৎসকদের সেই কারণ প্রথমে জানতে হবে, তারপর যথোপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করে সেই রোগের চিকিৎসা করতে হবে। এই ধরনের

বৈজ্ঞানিক মনোভাব তখনকার দিনের চিকিৎসকদের ছিল না।

হিপোক্রেটাস বলতেন ঃ অন্যান্য শিল্পকলার মত চিকিৎসাবিদ্যাও একটি মহান শিল্পকলা। কিন্তু চিকিৎসকদের অজ্ঞতার দরুনই এই শিল্পকলা অন্যান্য শিল্পকলার চেয়ে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। নবীন চিকিৎসকদের এর পুনরুজ্জীবনের ভার নিতে হবে। চিকিৎসক জীবন শুরু করবার সময় হিপোক্রেটাস তাঁর ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে শপথবাক্য পাঠ করাতেন। শপথে নবীন চিকিৎসকদের বলতে হতো ঃ

সারা জীবন ধরে আমি নিষ্ঠাভরে আমার কর্তব্য সম্পাদন করে যাবো এবং আমার পেশার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখব।

হিপোক্রেটাস যে শুধু চিকিৎসাবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন তা নয়, কৃতী অধ্যাপকও ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আজীবন যেসব প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন, তাঁর ছাত্ররা সেগুলি সংগ্রহ করে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর বিখ্যাত লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাতাশী খণ্ডে বিভক্ত ঐ রচনাবলী সুদীর্ঘ পাঁচশো বছর ধরে পরবর্তীকালের চিকিৎসকদের কাছে বাইবেলের মতই পবিত্র ও মূল্যবান গ্রন্থ বলে বিবেচিত হতো।

—

অ্যারিষ্টোট্ল
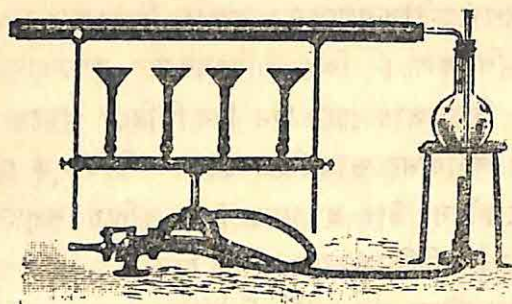
[খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৩৮৪—৩২১]

অনেক অনেকদিন আগে—যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবারও তিনশো চুরাশী বছর আগে, ঈজিয়ান সাগরের উত্তর-পশ্চিম তীরে 'থে্‌স' দেশের 'ষ্ট্রাগাইরা' নগরীতে জন্মেছিলেন এক মনীষী। তাঁর নাম 'অ্যারিষ্টোট্‌ল'। এর পিতা 'নিকোম্যাকাস' ম্যাসিডনের রাজদরবারে প্রখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন।

বাল্যকালে প্রধানতঃ পিতা ও গৃহশিক্ষকদের কাছেই অ্যারিষ্টোট্‌লের শিক্ষা শুরু হয়। সে শিক্ষার ধাঁচ ছিল গ্রীক শিক্ষাপদ্ধতিরই অনুরূপ। পিতার অনুপ্রেরণায় বাল্যকালেই অ্যারিষ্টোট্‌ল প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ঈজিয়ান সাগরের তীর থেকে নানারকম সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর নমুনা সংগ্রহ করে এনে সেগুলি খুঁটিয়ে-নাটিয়ে অনুশীলন করতে থাকেন। ফলে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অনেক কিছুই তিনি শিখে ফেলেন ছেলেবেলায়।

একটু বড় হয়ে সতেরো বছর বয়সে এথেন্সের অ্যাকাডেমিতে অ্যারি-ষ্টোট্‌ল তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন শুরু করেন। সুদীর্ঘ কুড়ি বছর এইখানেই তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। এখানে এসে অ্যারিষ্টোট্‌ল প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেটোকে শিক্ষাগুরু রূপে লাভ করেন। এখানে দর্শনশাস্ত্র ছাড়া অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখায় যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন অ্যারিষ্টোট্‌ল।

খ্রীষ্টপূর্ব তিনশো বিয়াল্লিশ অব্দে প্লেটোর মৃত্যুর পর অ্যারিষ্টোট্‌ল ম্যাসিডনিয়ার রাজা ফিলিপের আমন্ত্রণে ম্যাসিডনে চলে আসেন। তারপর রাজার অনুরোধে চোদ্দ বছর বয়স্ক রাজপুত্র আলেকজাণ্ডারের গৃহশিক্ষকতার ভার গ্রহণ করেন। সাত বছর অ্যারিষ্টোট্‌ল ছিলেন ম্যাসিডনিয়ায়। নিজের ছাত্র আলেকজাণ্ডারকে তিনি দেখেছিলেন বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সম্রাটরূপে।

ছাত্র সম্রাট হওয়ায় গুরুর অনেক সুবিধা হলো। গুরুর গবেষণার জন্যে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করলেন আলেকজাণ্ডার। গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে বহু কর্মচারী নিযুক্ত করলেন—যাঁদের কাজ ছিল জীবজন্তুর নমুনা সংগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ করা এবং অ্যারিষ্টোট্‌লের কাছে পর্যবেক্ষণের বিবরণ পেশ করা। এর মধ্য দিয়েই অ্যারিষ্টোট্‌লের চেষ্টায় গড়ে উঠলো এক নতুন বিজ্ঞান—নাম তার 'জীববিদ্যা'। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রাণীদের শ্রেণী বিভাগ করা ছাড়াও প্রাণীদেহ-ব্যবচ্ছেদ করেও বহু প্রাণীর দৈহিক গঠন-বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেন অ্যারিষ্টোট্‌ল।

শুধু কি জীববিদ্যা—ভূবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, তর্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান মতবাদ প্রকাশ ও গ্রন্থ রচনা করে গেছেন অ্যারিষ্টোট্‌ল। শ'খানেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। কিন্তু তার অধিকাংশই গেছে নষ্ট হয়ে বা হারিয়ে। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে অ্যারিষ্টোট্‌ল তাঁর মতামত লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তেমনটি কিন্তু করেননি পদার্থ ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে। তাই এইসব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর রচিত তত্ত্বের অধিকাংশই পরবর্তীকালে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে অ্যারিষ্টোট্‌লের কয়েকটি সিদ্ধান্তের কথা এখানে উল্লেখ করছি। অ্যারিষ্টোট্‌ল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে—

(১) উপর থেকে একই সঙ্গে ফেলে দিলে ভারী জিনিস হাল্কা জিনিসের চেয়ে বেশী তাড়াতাড়ি ভূপৃষ্ঠে এসে পড়বে।

(২) পদার্থ মাত্রেই স্থির অবস্থায় থাকতে চায়। গতি সৃষ্টি করতে হলে সেই স্থির পদার্থের উপর বল প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

(৩) শূন্যতা কখনও সৃষ্টি করা যায় না।

(৪) মাত্র চারটি উপাদানে এই পৃথিবী গড়া। আর সেই চারটি

উপাদান হলো—জল, মাটি, বায়ু ও আগুন।

(৫) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে স্থির হয়ে আছে পৃথিবী।

(৬) চাঁদের নিজস্ব আলো আছে।

দুঃখের বিষয়—ভ্রান্ত অনুমান ও পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করেই পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি অ্যারিষ্টোট্‌ল লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে এগুলির প্রায় সবই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে ভ্রান্ত হলেও সেকালে দেড় হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে অ্যারিষ্টোট্‌লের সিদ্ধান্তগুলি অভ্রান্ত বলেই মানুষ মেনে নিয়েছিল। এগুলি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেনি।

ছাত্র দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় অ্যারিষ্টোট্‌ল ম্যাসিডন থেকে এথেন্সে চলে আসেন এবং ৩৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে 'লাইসিয়াম' নামক স্থানে নিজের তত্ত্বাবধানে একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রটি একালের বিশ্ববিদ্যালয়েরই আদি সংস্করণ। এইখানে বসেই অ্যারিষ্টোট্‌ল অধ্যাপনা করতেন। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ লেখাই তিনি এইখানে বসে সমাপ্ত করেন।

ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর এথেন্সে ম্যাসিডন-বিরোধী মনোভাব বেড়ে উঠতে থাকে। তাঁর সঙ্গে ম্যাসিডনরাজের সংস্রব ছিল বলে তিনি এথেন্সবাসীদের রোষের কারণ হতে পারেন—এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে শেষ জীবনে অ্যারিষ্টোট্‌ল তাঁর অধ্যাপনা কেন্দ্র ছেড়ে 'ইউবোয়ে' দ্বীপে পালিয়ে যান এবং সেইখানেই ৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দেহত্যাগ করেন।

—
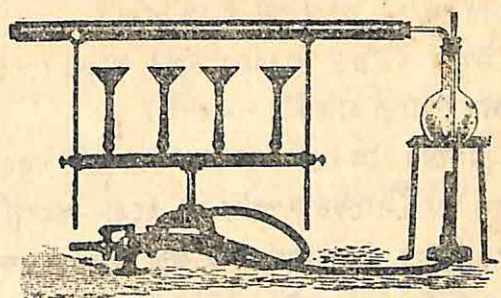
[খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৩৩০—২৭৫]

'ইউক্লিড' কে বলো তো ?

—হ্যাঁ, ইনি এক নতুন জ্যামিতি শাস্ত্রের আবিষ্কর্তা।

এঁর আবিষ্কৃত জ্যামিতিকে 'ইউক্লিডের জ্যামিতি' বলা হয়। স্কুলে তোমরা সেই জ্যামিতিই পড়।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মেরও প্রায় ৩৩০ বছর আগে, সম্ভবতঃ এথেন্স নগরীতে ইউক্লিড জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যকালের লেখাপড়া সম্ভবতঃ সেইখানেই সমাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ বলছি এই জন্য যে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-কথা খুব সামান্যই জানা যায়।

যাই হোক, বাল্যকালের লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে ইউক্লিড চলে আসেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে। আলেকজান্দ্রিয়া নগরী তখন জ্ঞানচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে এসে ইউক্লিড একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং জ্যামিতির অধ্যাপনা শুরু করেন। অধ্যাপক হিসাবে ইউক্লিড ছিলেন খুবই ধৈর্যশীল। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি অমায়িক ব্যবহার করতেন। পাণ্ডিত্যও ছিল তাঁর অগাধ। এইসব কারণে ছাত্ররা তাঁকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল সবার মুখে মুখে কিন্তু সাধারণ লোক তাঁর লেখা জ্যামিতি পড়ে রস উপলব্ধি করতে পারতো না। মিশরের রাজা প্রথম টলেমীও সেই অসুবিধায় পড়ে একবার ইউক্লিডকে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন : আচ্ছা, বলুন তো—রাজা-রাজড়াদের জন্যে আপনার জ্যামিতি শিক্ষার কোনো সহজ পথ আছে কিনা ?

উত্তরে ইউক্লিড কি বলেছিলেন জানো ?—বলেছিলেন : না, জ্যামিতি শিক্ষার কোনো রাজকীয় পথ নেই।

মিশরের নীল নদে তখনকার দিনে প্রতি বছরই দারুণ বন্যা হতো। সে বন্যায় বহু লোকের সম্পত্তি নষ্ট হতো—ঘরবাড়ি ধুয়ে-মুছে যেতো। সেই সময়ে জমির সীমা নির্ধারণের জন্য জরিপের কাজে মিশরীয়রা জ্যামিতির সাহায্য নিতো। গ্রীকরা কিন্তু জ্যামিতির ব্যবহারিক দিকটা নিয়ে তত উৎসাহী ছিল না। তারা শুধু জ্যামিতির তাত্ত্বিক দিকটা জেনেই সন্তুষ্ট থাকতো। শোনা যায়, একবার ইউক্লিডের এক ছাত্র নাকি ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল : জ্যামিতি শিখে কি হবে। বাস্তব জীবনে এর কোনো প্রয়োগই তো দেখি না আমি। এ কথা কানে গেলে ইউক্লিড নাকি তাঁর চাকরকে ডেকে বলেছিলেন : ঐ ছাত্রটিকে কিছু পয়সা দিয়ে দাও, কারণ জ্যামিতি শিখে ও কিছুটা লাভবান হতে চায়।

হিপোক্রেটাস, থেল্স, পিথাগোরাস প্রমুখ পূর্বসূরীরা জ্যামিতি নিয়ে যেসব কাজ করে গিয়েছিলেন, ইউক্লিড সেগুলিকে সহজভাবে প্রকাশ করে, ঠিকমত পর পর সাজিয়ে, নতুন নতুন তত্ত্ব সংযোজন করে এক নতুন রূপদান করেছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে অবস্থানকালেই ইউক্লিড তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এলিমেণ্টস্ অফ জিওমেট্রি' রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন। বিরাট কলেবর এই গ্রন্থটি তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। সব ক'টি খণ্ডই যে ইউক্লিড নিজে লিখেছিলেন—তা নয়। কোনো কোনো খণ্ডের অংশবিশেষ তাঁর ছাত্রদের লেখা। কিন্তু লেখার পরিকল্পনা, নির্দেশ ও সম্পাদনা ছিল তাঁরই। 'এলিমেণ্টস্' গ্রন্থের প্রথম চারটি খণ্ডে ত্রিভুজ, বৃত্ত, বহুভুজ, সমান্তরাল সরলরেখা ও পিথাগোরাসের উপপাদ্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। পঞ্চম খণ্ডে আছে অনুপাত-তত্ত্ব। ষষ্ঠ খণ্ডে আছে পঞ্চম খণ্ডের উন্নততর আলোচনা। সপ্তম থেকে নবম খণ্ডে আছে পূর্ণ সংখ্যার ধর্মের আলোচনা। দশম খণ্ডে আছে জটিল অমূলদ রাশির আলোচনা। আর একাদশ থেকে ত্রয়োদশ খণ্ডে আছে পিরামিড, সিলিণ্ডার, কোণ, গোলক ইত্যাদি ঘন বস্তুর আলোচনা। ইউক্লিড বিন্দু, সরলরেখা, ত্রিভুজ ইত্যাদিরও সঠিক সংজ্ঞা উল্লেখ করে গেছেন।

'এলিমেণ্টস্' ছাড়া আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ইউক্লিড, কিন্তু তার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। হারায়নি যে দু'টি গ্রন্থ, তার একটির নাম 'অপটিক্স' এবং অপরটির নাম 'ডাটা'। 'এলিমেণ্টস্' গ্রন্থটি তো পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই অনুবাদিত হয়েছে এবং দু' হাজার বছরেরও অধিককাল ধরে জ্যামিতি শিক্ষার মূল গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সব দেশে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউক্লিডের এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটির কিছু কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে এবং সেগুলি সংশোধন করে নেওয়া হয়। কিন্তু গ্রন্থের মূল তত্ত্বগুলি আজও অম্লান হয়ে আছে—সন্দেহের কোন অবকাশ রাখেনি।

আধুনিক বিজ্ঞান অনেক উন্নত—একথা সত্যি, কিন্তু সেই গ্রীক যুগের এক অতি প্রাচীন বিজ্ঞানী কর্তৃক আবিষ্কৃত তত্ত্ব আজও সমাদর লাভ করছে —সত্য বলে আজও স্বীকৃত হয়ে আছে—এটা কম গৌরবের কথা নয়। খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৫ অব্দে দেহত্যাগ করলেও ইউক্লিডের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে আজও অমর হয়ে আছে—থাকবেও চিরকাল।

—

আর্কিমিডিস

(খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ২৮৭—২১২)

জাহাজঘাটে সেদিন দারুণ ভিড়।

হাজার হাজার লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে একটা বিস্ময়কর পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করবে বলে। বিরাট একটা জাহাজের সঙ্গে মস্ত বড় একটা দড়ির এক প্রান্ত বাঁধা হয়েছে। দড়িটার অপর প্রান্ত কয়েকটা কপিকলের ওপর দিয়ে ঘুরে এসে পৌঁচেছে জাহাজের বিপরীত দিকে।

পরীক্ষার সময় উপস্থিত।

ভিড়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন সিসিলির রাজা 'হীয়েরো'। কপিকলের ওপর দিয়ে ঘুরে আসা দড়ির মুক্ত প্রান্তটা দৃঢ়ভাবে চেপে ধরে দড়িতে মৃদু টান দিলেন।

উপস্থিত বিশাল জনতা তখন নীরব, নিস্তব্ধ। কি হয় না হয় তা দেখবার জন্যে উদ্গ্রীব। কিন্তু কিছুই হলো না।

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বিজ্ঞানী—যিনি ঐ পরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন। তিনি তখন রাজাকে বললেনঃ আর একবার টানুন মহারাজ। আর একটু জোরে টানুন দেখি।

তাই করলেন রাজা হীয়েরো।

দড়িটা জোরসে টানতেই দড়ির অপর প্রান্তে বাঁধা জাহাজটা জল থেকে শূন্যে উঠে পড়লো। দড়ি ছেড়ে দিয়ে রাজা অভিনন্দন জানালেন বিজ্ঞানীকে। চারদিকে তখন হাততালি আর জয়োল্লাস। যে বিজ্ঞানী এ পরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন তাঁর মুখ তখন জয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত।

কিন্তু কে এই বিজ্ঞানী, আপন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে যিনি অসাধ্য সাধন করলেন ?

—ইনি আর কেউ নন—'আর্কিমিডিস'।

খ্রীষ্টজন্মের ২৮৭ বছর আগে গ্রীস দেশের অন্তর্গত সিসিলির রাজধানী 'সাইরাকিউস' নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর্কিমিডিস। তাঁর পিতা 'ফেইডিয়াস' ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ।

মিশর দেশের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ছিল সেকালের এক প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। আর্কিমিডিস সেখানেই লেখাপড়া করলেন। ছাত্রাবস্থায় গণিত ও জ্যামিতি পড়তে তাঁর খুব ভাল লাগতো। বিখ্যাত পণ্ডিত ইউক্লিডের ছাত্র 'কনন্' ছিলেন আর্কিমিডিসের অন্যতম শিক্ষাগুরু।

আলেকজান্দ্রিয়ায় পড়াশুনা করে আর্কিমিডিসও হলেন গণিত-শাস্ত্রবিদ। গণিতশাস্ত্র চর্চা করে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে যাবেন—মনে মনে এই সংকল্প করে আর্কিমিডিস চলে এলেন 'সাইরাকিউসে'। সেখানে এসে গণিতবিদ্যা চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। কাগজ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই কখনও তাঁকে দেখা যেতো বালির ওপরে রেখা টেনে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে। কখনও বা দেখা যেতো, মাটিতে ছাই দিয়ে রেখা টেনে মাপজোপ করতে। আবার কখনও বা দেখা যেতো যন্ত্রপাতির সামনে বসে নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করতে। কি নিয়মে ঐসব যন্ত্রপাতি কাজ করছে—তা আবিষ্কারের চিন্তা করতে।

আজীবন এমনিভাবে সাধনা চালিয়ে গিয়ে আর্কিমিডিস শুধু গণিতজ্ঞই হলেন না, কারিগরী বিদ্যায়ও বিশারদ হয়ে উঠলেন। বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হলেন তিনি।

রাজা হীয়েরো ছিলেন আর্কিমিডিসের বিশেষ বন্ধু ও আত্মীয়। একবার তিনি একটা সোনার মুকুট তৈরি করালেন। কিন্তু তাঁর সন্দেহ হলো—স্যাকরা যদি মুকুটে সোনার সঙ্গে খাদ মিশিয়ে থাকে!

অমনি বন্ধুর ডাক পড়লো রাজসভায়।

রাজা হীয়েরো অনুরোধ করলেন—মুকুটটা না গালিয়ে বলে দিতে হবে ওতে খাদ আছে কিনা।

আর্কিমিডিস কয়েকদিন সময় নিলেন—ভাববার জন্যে। ক'দিন ভেবে ভেবেই সারা হলেন কিন্তু কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে ঐ সোনার মুকুটই তাঁর মন জুড়ে রইলো। ভাবতে ভাবতে একদিন কাপড়-চোপড় ছেড়ে তিনি জলভর্তি চৌবাচ্চায় যেমনি স্নান করতে নামলেন, অমনি খানিকটা জল উপচে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐ সমস্যাটা সমাধানের একটা সূত্র তিনি খুঁজে পেলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি তখন চীৎকার করে উঠলেন—'ইউরেকা! ইউরেকা!' অর্থাৎ 'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলে। কিন্তু কি পেলেন তিনি?—পেলেন এক অমূল্য সম্পদ। সোনাদানা নয়—সোনার মুকুটে খাদ আছে কিনা তা বের করার উপায় খুঁজে পেলেন। আবিষ্কৃত হলো আর্কিমিডিসের তত্ত্ব—বিজ্ঞানের এক মূল্যবান তত্ত্ব।

আর্কিমিডিস ঐ মুকুটের সমান ওজনের একতাল সোনা নিলেন। সেটাকে কানায় কানায় জলভরা একটা পাত্রে ডোবালেন। সোনার তাল যতটা জল সরালো তা মেপে রাখলেন। তারপর অমনিভাবে মুকুটটাকেও জলভরা পাত্রে ডোবালেন। মুকুট যতটা জল সরালো তাও মাপলেন। দেখলেন যে খাঁটি সোনা যতটা জল সরিয়েছে, মুকুট তার চেয়ে বেশী পরিমাণ জল সরিয়েছে। কাজেই প্রমাণ হলো, রাজার মুকুটে স্যাকরা খাদ মিশিয়েছে।

এই ঘটনার পর আর্কিমিডিসের প্রতি রাজা হীয়েরোর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। তিনি আর্কিমিডিসকে অনুরোধ করলেন—সাধারণ মানুষের উপকারে আসে অথবা যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা যায়—এমন সব যন্ত্রপাতি আপনি তৈরি করতে থাকুন। রাজার কথাটা আর্কিমিডিসের মনে ধরলো। নিত্য-নতুন আবিষ্কারের কাজে তিনি মন দিলেন। আর তার ফলেই আবিষ্কৃত হলো 'কপিকল'—যা নিয়ে প্রথম পরীক্ষার কথা গোড়াতেই বলেছি। শুধু কি কপিকল—দিগ্‌দর্শন যন্ত্র, আর্কিমিডিস-স্ক্রু ও

অনেকগুলি সমরাস্ত্রও আবিষ্কার করলেন এই প্রতিভাবান মানুষটি।

'আর্কিমিডিস-স্ক্রু' একটি লম্বা ফাঁপা কর্ক-স্ক্রু ভিন্ন আর কিছুই নয়। একটা দণ্ডের সঙ্গে আনতভাবে ওটাকে আটকাতে হয়। এই ফাঁপা কর্ক-স্ক্রুর আনত মুখটি জলাশয়ে বা জলাধারে ডুবিয়ে রেখে অপর মুখটির তলায় একটি খালি চৌবাচ্চা স্থাপন করতে হয়। তারপর হাতলের সাহায্যে স্ক্রুটিকে ঘোরালেই ওর মধ্য দিয়ে জল উঠে এসে খালি চৌবাচ্চাকে ভর্তি করতে থাকে। একালের পাম্প আবিষ্কারের আগে আর্কিমিডিসের স্ক্রুর সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে জল সেচ করা হতো। জাহাজের খোলে আবদ্ধ জলকেও এই স্ক্রুর সাহায্যে তুলে অন্যত্র ফেলা দেওয়া হতো।

যখন রোমদেশের সেনাপতি 'মার্সেলাস' তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে স্থল ও জলপথে 'সাইরাকিউস' আক্রমণ করতে এসেছিলেন, তখন রাজা হীয়েরোর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আর্কিমিডিস। নিত্য-নতুন সমরাস্ত্র আবিষ্কার করে তিনি সাইরাকিউসকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মস্ত বড় বড় অবতল আয়নার সাহায্যে শত্রুপক্ষের জাহাজের ওপর সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে ফেলে সেই জাহাজগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সমুদ্রের তীরের দিকে সাইরাকিউস নগরী প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এই প্রাচীরের পেছনে আর্কিমিডিস বসিয়েছিলেন বড় বড় যন্ত্র। ঐ সব যন্ত্রের সাহায্যে মস্ত বড় বড় পাথরের চাঙ্গড় বর্ষণ করে শত্রুসৈন্যদের তিনি ছত্রভঙ্গ করে দিতেন। আবার ঐ প্রাচীরের ওপরে বিরাটকায় কতকগুলি কপিকল বসিয়ে তার সাহায্যে ভারী ভারী লোহা, পাথর ইত্যাদি তিনি ছুঁড়ে ফেলতেন শত্রুপক্ষের জাহাজের ওপরে। ফলে শত্রুপক্ষের বহু জাহাজ জলমগ্ন হতো। কোনো কোনো কপিকলে অতিকায় হুক বসানো থাকতো। সেই হুক জাহাজকে আঁকড়ে ধরতো। আর কপিকলের সাহায্যে সেই জাহাজকে তখন শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলা হতো। এর ফলে শত্রুপক্ষের বহু যুদ্ধজাহাজ ভেঙ্গেচুরে সাগরে ডুবে যেতো।

এত চেষ্টা করেও সাইরাকিউসকে রক্ষা করা গেল না শেষ পর্যন্ত। রোমক সেনাপতি মার্সেলাসের সৈন্যবাহিনী আট মাস ধরে অবরোধ করে রাখলো সাইরাকিউস নগরীকে। খাদ্য গেল ফুরিয়ে। নিরুপায় হয়ে ক্ষুধায় কাতর সাইরাকিউসের অগণিত অধিবাসীকে আত্মসমর্পণ করতে হলো রোমানদের কাছে।

শত্রুপক্ষের লোক হলেও রোমান সেনাপতি মার্সেলাস আর্কিমিডিসকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আর্কিমিডিস সাধারণ মানুষ নন—তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ। তাই রোমান সৈন্যরা যখন সাইরাকিউস নগরীতে প্রবেশ করলো—চালালো লুঠতরাজ, তখন সেনাপতি মার্সেলাস তাঁর সৈন্যদের সতর্ক করে দিয়ে বললেনঃ দেখো, আর্কিমিডিসের গায়ে যেন আঁচড়টি না লাগে!

কিন্তু সে আদেশ, আদেশই রয়ে গেল।

রোমান সৈন্যরা যখন সাইরাকিউস নগরীতে লুঠতরাজে মত্ত, তখন বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস বালির ওপর ছক কেটে এক জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধানে মত্ত। শত্রুসৈন্যরা পঁচাত্তর বছরের সেই বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলো তাঁর পরিচয়। কিন্তু জবাব কে দেবে! তিনি যে তখন গণিততত্ত্ব নিয়ে তন্ময়!

উত্তর না মেলায় শত্রুসৈন্য তাঁর দেহে জোরে একবার পদাঘাত করলো। তখন সেই বৃদ্ধ একবার শুধু বললেনঃ সাবধান! আমার আঁকজোক যেন মুছে না যায়!

কথাও শেষ হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ারের আঘাতে আর্কিমিডিসের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সেনাপতি মার্সেলাস এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি এই মহান বিজ্ঞানীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর একটি সুন্দর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে দিলেন। আর সেই স্মৃতিসৌধের ওপরে খোদাই করে দিলেন একটি জ্যামিতিক চিত্র—একটি বেলনের (সিলেণ্ডারের) মধ্যে একটি গোলকের চিত্র।

এ রকম চিত্রাঙ্কনের হেতু কি?

কারণ, আর্কিমিডিস নাকি তাঁর কবরের ওপরে এইরকম চিত্রাঙ্কনেরই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। একটি শহরের নিরাপত্তা রক্ষার চেয়ে একটি গোলক বা একটি বেলনের আয়তন নির্ণয়ের পদ্ধতিকেই নাকি তিনি অনেক বেশী মূল্যবান বলে মনে করতেন। একই ব্যসবিশিষ্ট একটি গোলক এবং একটি বেলন তৈরি করে বেলনের মধ্যে গোলকটিকে বসিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, ওদের আয়তনের অনুপাত ২ :৩ । আর্কিমিডিস বলেছিলেন—এইটাই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

—
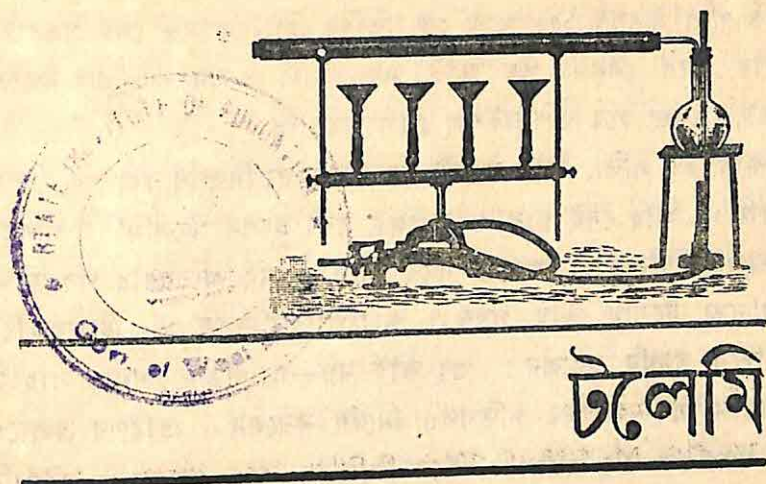
টলেমি

[খ্রীষ্টাব্দ ৯০—১৬৮]

প্রাচীনকালে মিশর দেশের আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ছিল শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। সেখানে একটি বিরাট লাইব্রেরী ও যাতুঘর ছিল। দেশ-বিদেশের জ্ঞানপিপাসু মানুষ সেখানে ছুটে যেতেন জ্ঞানান্বেষণে। আলেকজান্দ্রিয়ার সেই বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরীতে বিভিন্ন পণ্ডিতদের, বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও তর্কশাস্ত্রবিদ্‌দের লেখা বই ও পুঁথি সযত্নে রাখা থাকতো। গবেষকরা সেখানে গিয়ে ঐ সব পুঁথিপত্র ঘেঁটে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হতেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ার ঐ বিখ্যাত লাইব্রেরীতে এক গ্রীক যুবক নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তাঁর নাম ছিল 'ক্লডিয়াস টলেমিউস' ওরফে 'টলেমি'। টলেমি মিশর দেশেরই সন্তান। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। যেটুকু জানা যায়—তা শুধু তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে।

টলেমি আলেকজান্দ্রিয়ায় এসেছিলেন জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে গবেষণা করতে। প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদ্‌দের লেখা পুঁথি পড়তে পড়তে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, একের মতের সঙ্গে অপরের মতের কোনই মিল নেই। যথা, খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০ অব্দে অ্যারিস্টারকাস বলেছিলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে আছে সূর্য। কিন্তু পরে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে অ্যাপোলোনিয়াস

বলেন—না, তা নয়। ঘূর্ণায়মান এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে আছে পৃথিবী। আরও পরে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দে জ্যোতির্বিদ হিপ্পারকাসও সেই মতবাদকে স্বীকার করে নেন। শুধু তাই নয়—তাঁরা বলেন যে, গ্রহ-নক্ষত্রেরা পৃথিবীকে কেন্দ্র করে এপিসাইকল্ বৃত্তপথে ঘোরে।

কার তত্ত্ব সত্যি, আর কারটা যে মিথ্যে তা নিরূপণ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর সেই দুঃসাধ্য কাজেই ব্রতী হলেন 'টলেমি'। গণিত ও তর্কশাস্ত্রটা ভালভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে অনেক গবেষণার পর অনেক ভেবেচিন্তে টলেমি তাঁর পূর্বসূরী অ্যাপোলোনিয়াস ও হিপ্পারকাসের মতবাদকে সমর্থন করলেন। শুধু তাই নয়—গাণিতিক গণনার সাহায্যে ঘূর্ণায়মান গ্রহ-নক্ষত্রদের গতিপথও নির্দেশ করলেন। তারপর ব্রহ্মাণ্ডের গঠন সম্পর্কিত তত্ত্ব একখানি বইতে লিপিবদ্ধ করে গেলেন। বইখানির নাম 'দি গ্রেট ট্রিটিজ অফ অ্যাস্ট্রনমি'। বইখানিকে 'আলমাজেস্ট'ও বলা হয়। এই বইতেই টলেমি বলে গেলেন—আকাশ গোলাকার, পৃথিবীও তাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী অবস্থান করছে স্থিরভাবে। সুদীর্ঘ ১৪০০ বছর ধরে টলেমির এই তত্ত্ব অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত হয়েছিল। পরে অবশ্য 'কোপার্নিকাস' এই তত্ত্বকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করেন।

জ্যোতির্বিদ্যায় ত্রিকোণমিতির প্রয়োগও টলেমির একটি অক্ষয় কীর্তি। বৃত্তকে তিনি ৩৬০টি সমান ভাগে বিভক্ত করে এক একটি ভাগের নাম দিয়েছিলেন 'ডিগ্রী'। ডিগ্রীকে আবার তিনি 'মিনিট' ও 'সেকেণ্ডে' বিভক্ত করেছিলেন। যে কোনো বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত-বোধক ধ্রুবক রাশিকে গ্রীক অক্ষর 'পাই' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। টলেমি এই ধ্রুবক সংখ্যা 'পাই'-এর মান নির্ধারণ করেছিলেন। 'পাই'-এর সেই মান হচ্ছে ৩·১৪১৬।

এসব কাজ ছাড়াও টলেমি ১০২৮টি তারকার পরিচিতি সহ একটি তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর আগে আর কেউ এত বেশী সংখ্যক তারকার পরিচিতি-তালিকা প্রণয়ন করতে পারেননি।

টলেমি যে শুধু ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের প্রবক্তারূপে বিখ্যাত ছিলেন তা নয়। তিনি গণিত, ভূগোল ও সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে সেকালের ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ বহু স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিলেন টলেমি। তিনি ভারতবর্ষের যে

ভৌগোলিক বিবরণ লিখে গেছেন, তাতে বহু জনপদ, নদ-নদী, পর্বত, নগরী ও বন্দরের উল্লেখ আছে। তিনি তাদের প্রত্যেকটির অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্ণয় করে গেছেন। কিন্তু তাঁর গণনায় অনেক ভুল ছিল। তাই ভারতের সেইসব স্থান কোথায় অবস্থিত ছিল এবং তাদের বর্তমান নাম কি তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু যে ক'টি স্থান সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়, তার সংখ্যাও একেবারে নগণ্য নয়। ভূগোল নিয়ে টলেমির এসব গবেষণার দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন সেকালের নাবিক, বণিক ও পরবর্তী-কালের ভূগোল তত্ত্ববিদেরা।

টলেমি যেকালের মানুষ, সেকালে বিজ্ঞান উন্নত হয়নি। তখন ছিল না টেলিস্কোপ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। তারই মাঝে চিন্তাশক্তি, অনুমান ও যুক্তির ওপর নির্ভর করে জ্যোতির্বিদ্যার যে তত্ত্ব টলেমি প্রচার করে গেছেন তা বর্তমানে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হলেও সেকালের পটভূমিতে ছিল যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাই জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে টলেমি আজও অমর হয়ে আছেন।

—
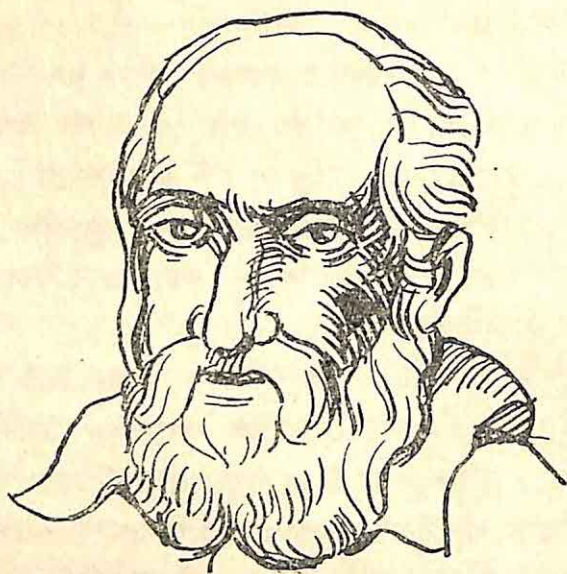
গ্যালিলিও গ্যালিলি

(খ্রীষ্টাব্দ ১৫৬৪—১৬৪২)

উনসত্তর বছরের বৃদ্ধ। মাথায় এক রাশ তুষার-শুভ্র চুল, পাকা দাড়িতে মুখখানি ভরা। দূরবীন দিয়ে যে চোখ দু'টি একদা আকাশের নক্ষত্ররাজির অসীম বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করেছিল, আজ তার তেজ স্তিমিত। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হিসাবে এতদিন যিনি বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়িয়ে এসেছিলেন—আজ তিনি এক বিশেষ বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায়। এ বিচারালয় হচ্ছে ধর্মমতের বিরুদ্ধে মত দমনের জন্যে স্থাপিত বিচারালয়। এই বিচারালয়ে দাঁড়িয়েই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে সেদিন বলতে শোনা গেল: আমি, গ্যালিলিও গ্যালিলি ঘোষণা করছি যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে সূর্য আছে স্থির হয়ে—এই মতবাদ মিথ্যা। আমি শপথ করছি যে এই মিথ্যা মতবাদ আমি পরিত্যাগ করব এবং আমার ভুল সংশোধন করে নেব।

হ্যাঁ, সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিওকে বৃদ্ধ বয়সে এমনিভাবে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। অভিযুক্ত হতে হয়েছিল

প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগে। বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপরোক্ত ঘোষণা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এর পরও তাঁকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল স্বগৃহে অন্তরীণ থেকে। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে তাঁর লেখা বইগুলি চার্চ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

গ্যালিলিও যে যুগের মানুষ, সে যুগে অ্যারিস্টোট্‌লকে বিজ্ঞান বিষয়ক শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বলে মনে করা হতো এবং তার সঙ্গে মতানৈক্যের ব্যাপারটা কেউই পছন্দ করতো না। কিন্তু গ্যালিলিও ছিলেন নির্ভীক পুরুষ। যা সত্য, তা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি বলতেন: বিজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রশ্নের স্বাধীনতা এবং তার উত্তর দানের স্বাধীনতা থাকা উচিত। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই গ্যালিলিও একদা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠন সম্পর্কে অ্যারিস্টোট্‌লের মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। বলেছিলেন: অ্যারিস্টোট্‌লের মতবাদ ভুল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী নেই—আছে সূর্য। সূর্য আছে স্থির হয়ে। আর তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে গ্রহ-উপগ্রহের দল।

গ্যালিলিওর ঐ ঘোষণা নতুন কিছু নয়। এর আগে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী কোপারনিকাস তাঁর একখানি বইতে এই মতবাদই প্রচার করেছিলেন। তাঁর সেই মতবাদ চার্চ কর্তৃক নিন্দিতও হয়েছিল। কিন্তু অনেককাল কেটে যাওয়ায় লোকে সে কথা ভুলে গিয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে গ্যালিলিও আবার যখন ঘোষণা করলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠন বিষয়ে তিনি কোপারনিকাসের সঙ্গে একমত, তখন নতুন করে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। ক্যাথলিক চার্চ কর্তৃপক্ষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। আর তারই পরিণতি স্বরূপ একদিন চার্চের বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে গ্যালিলিওকে ঘোষণা করতে হলো যে, তিনি তাঁর মতবাদ পরিত্যাগ করবেন এবং নিজের ভুল সংশোধন করে নেবেন।

সে যুগে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমতবাদীদের চার্চের বিচারালয়ে বিচার করা হতো। চার্চের অনুজ্ঞাভঙ্গকারীদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হতো। অনেক সময় মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হতো। গ্যালিলিও অত্যাচারের ভয়েই বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে ঐ রকম ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ইটালী দেশে 'পিসা' নামে একটি শহর আছে। সেই শহরে ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্যালিলিওর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রতিভাসম্পন্ন গায়ক ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ছেলেবেলাতেই গ্যালিলিওর মধ্যে প্রবল দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ দেখা যায়। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ হয় সেইখানেই।

১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘটনা। গ্যালিলিওর বয়স তখন মাত্র উনিশ বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন।

'পিসা' শহরের একটি গীর্জায় একদিন তিনি গিয়েছিলেন প্রার্থনা করতে। সেখানে তিনি দেখলেন যে, একটি তেলের বাতি শিকলের এক প্রান্তে ঝোলানো আছে। বাতি সমেত শিকলটি এদিক-ওদিক দুলছে। আর যদিও প্রতিটি দোলনের বিস্তার আগেরটির চেয়ে কিছুটা কম, তবুও প্রতিটি দোলনে সময় লাগছে একই।

তুচ্ছ ঘটনা।

কোনো সাধারণ লোক এ নিয়ে মাথা ঘামাননি। কিন্তু গ্যালিলিওর কৌতূহলী মনে ঐ তুচ্ছ ঘটনাই প্রশ্ন জাগালো—'কেন এমন হয়?'

সেই প্রশ্ন মনে নিয়েই বাড়ি ফিরে এলেন গ্যালিলিও। বাড়িতে এসে একটা দড়ির প্রান্তে ওজন বেঁধে দড়ি সমেত ওজনটাকে তিনি দোলাতে লাগলেন। এবারেও তিনি লক্ষ্য করলেন যে, যদিও আগেরটা থেকে পরের দোলনের বিস্তার ক্রমশ ছোট হচ্ছে, তবুও প্রতিটি দোলনের ক্ষেত্রে সময় লাগছে একই।

এই পরীক্ষার ফলেই গ্যালিলিও আবিষ্কার করলেন 'পেণ্ডুলামের সূত্র'। পেণ্ডুলামের সূত্র সূচনা করলো আধুনিক গতি-বিজ্ঞানের। এই সূত্র আজও নক্ষত্রের গতি নিরূপণ করতে ও ঘড়ির সময় নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম আবিষ্কারের মাত্র ছ'বছর বাদে গ্যালিলিওর দ্বিতীয় আবিষ্কার বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করলো। গ্যালিলিওর বয়স তখন পঁচিশ বছর। পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক তিনি।

দু'হাজার বছর আগে মনীষী অ্যারিস্টোট্‌ল বলে গিয়েছিলেন যে, একই সঙ্গে ফেলে দিলে একটি ভারী বস্তু একটি হালকা বস্তু অপেক্ষা তাড়াতাড়ি

মাটিতে পড়ে। তার মানে হালকা বস্তুর চেয়ে ভারী বস্তুর পতনের বেগ দ্রুততর।—গ্যালিলিও অ্যারিস্টোট্‌লের মতকে যাচাই করে দেখতে উদ্যোগী হলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর কয়েকজন সহকর্মী অধ্যাপককে নিয়ে পিসার বিখ্যাত হেলানো গম্বুজে উঠলেন। সঙ্গে নিলেন দু'টি লোহার বল। একটির ওজন দশ পাউণ্ড। অপরটির ওজন এক পাউণ্ড। গম্বুজের আলসেয় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গ্যালিলিও দু'টি বলই এক সঙ্গে ফেলে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার—দু'টি বলই এক সঙ্গে মাটি স্পর্শ করলো। গ্যালিলিও প্রমাণ করলেন যে, পতনশীল বস্তুর গতি তার ওজনের উপর নির্ভরশীল নয়। মিথ্যা প্রমাণিত হলো অ্যারিস্টোট্‌লের মতবাদ।

কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও গ্যালিলিওর সহকর্মী অধ্যাপকেরা অ্যারিস্টোট্‌লের পুরনো মতবাদকেই আঁকড়ে ধরে রইলেন। কিছুতেই গ্যালিলিওর আবিষ্কারকে সত্য বলে মেনে নিলেন না। তাঁরা গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে লাগলেন—ষড়যন্ত্র চালাতে লাগলেন। শেষে গ্যালিলিও পিসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরে আসতে বাধ্য হলেন।

পিসা থেকে চলে এসে গ্যালিলিও ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে যোগ দিলেন। এখানে তিনি বেশী বেতন পেলেন, আর পেলেন কর্মে স্বাধীনতা। এখানে নির্বিবাদে তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। এইখানে থাকা কালেই তিনি 'সেক্টর' নামক একটি গণনাকারী যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু এখানে গ্যালিলিও যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করলেন তা বহুগুণ শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হলো। এইখানে কর্মরত অবস্থাতেই গ্যালিলিও তাঁর দূরবীন যন্ত্র চোখে লাগিয়ে রাতের পর রাত আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন—চাঁদের পিঠে আছে পর্বত ও উপত্যকা। বুঝলেন, চাঁদ ও অন্যান্য উপগ্রহদের নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলোই তাদের দেহ থেকে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছয়। তিনি দেখলেন যে, কোটি কোটি তারার পুঞ্জ নিয়ে গড়ে উঠেছে 'ছায়াপথ'। সেই দূরবীন দিয়েই তিনি দেখলেন যে, বৃহস্পতিকে ঘিরে ঘুরছে চারটি উপগ্রহ। বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ আবিষ্কারই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্যালিলিওর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

যখনই কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছেন, তখনই তা পুস্তকের মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করে গেছেন। চার্চের আদালত কর্তৃক শাস্তি পাওয়ার পরও তিনি চুপ করে বসে থাকেননি ; রচনা করেছিলেন তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ। সে গ্রন্থে গতি ও বলবিদ্যা সম্পর্কিত তাঁর গবেষণার ফলগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তখন তা প্রকাশ করার কোনো উপায় ছিল না। লুকিয়ে তিনি সেই পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন হল্যাণ্ডে। সেখানে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বইখানি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখন গ্যালিলিও অন্ধ—হারিয়েছেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি। শেষ গ্রন্থটিকে ছাপার অক্ষরে দেখবার সুযোগ তাঁর হলো না। অন্ধ অবস্থায় আর ক'টি বছর কাটিয়ে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করলেন, কিন্তু ভাবীকালের বিজ্ঞানীদের কাছে রেখে গেলেন এক মহৎ দৃষ্টান্ত। সেই দৃষ্টান্ত হলো—ভ্রান্ত পুরনো ধারণা বা সিদ্ধান্তকে ত্যাগ করে পরীক্ষালব্ধ সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার সৎসাহস।

—
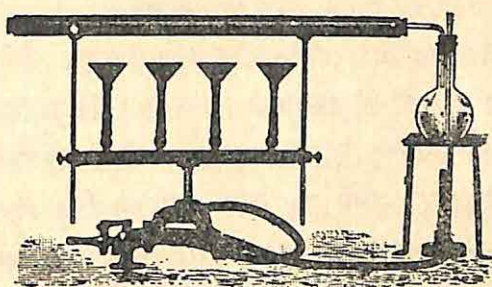
উইলিয়াম হারভে

(খ্রীষ্টাব্দ ১৫৭৮—১৬৫৭)

ইটালীর পাছুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শব-ব্যবচ্ছেদ ঘর। সেই ঘরের গ্যালারিতে অনেক ছাত্রের সঙ্গে বসে আছে একজন ইংরাজ ছাত্র। ছাত্রটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে অপারেশন টেবিলের উপর। সেখানে শব-ব্যবচ্ছেদ করছেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরস্থান (অ্যানাটমি) বিদ্যার অধ্যাপক ফ্যাব্রিসাস্। আর 'উইলিয়াম হারভে' নামক ঐ কৌতূহলী ইংরাজ ছাত্রটি লণ্ডন থেকে সুদূর ইটালীর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে সেকালকার বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ফ্যাব্রিসাসের কাছে শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করতে।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন মানুষের দেহের গঠনকৌশল মোটামুটি জানা থাকলেও, হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ ও রক্ত-সংবহন তন্ত্র মানুষের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। তাই কোনো কোনো চিকিৎসককে বলতে শোনা যেতো : হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ জানেন শুধু ভগবান। কেউ কেউ বলতেন : রক্ত দু'রকমের। এক প্রকার রক্ত ধমনী দিয়ে আনাগোনা করে, আর এক প্রকার রক্ত শিরা দিয়ে বয়ে চলে। কেউ কেউ বলতেন : রক্ত উৎপাদন করে আমাদের লিভার। আবার কেউ বলতেন : রক্ত উৎপন্ন হয় পেট থেকে। একালের চিকিৎসকেরা এ সব কথা শুনে যে হাসবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তখনকার দিনের চিকিৎসকেরা রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের এ অজ্ঞতা যিনি দূর করতে সক্ষম হন, তাঁরই নাম

'উইলিয়াম হারভে'। তিনিই সর্বপ্রথম মানুষের দেহে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার নির্ভুল ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

লণ্ডনের এক ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন 'উইলিয়াম হারভে'। ১৫৯৭ সালে মাত্র উনিশ বছর বয়সে হারভে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। তারপর তিনি ডাক্তারী পড়তে যান ইটালীর পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন অধ্যাপনা করতেন বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক ও শরীর-বিদ্যার শিক্ষক—অধ্যাপক ফ্যাব্রিসাস। ফ্যাব্রিসাস বই দেখে অ্যানাটমি পড়াতেন না। শব-ব্যবচ্ছেদ করে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকেই তিনি অ্যানাটমি পড়াতেন। অধ্যাপক ফ্যাব্রিসাস তখন সবেমাত্র আবিষ্কার করেছেন যে, শিরার মধ্যে একদিক-বন্ধ-দরজা বা একপ্রকার ভাল্‌ব আছে। কিন্তু এই ভালবের কাজ কি, তা তিনি নির্দেশ করতে পারেননি।

গুরুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করার ভার নিলেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র উইলিয়াম হারভে। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারী পাশ করে হারভে ইংলণ্ডে ফিরে আসেন ও লণ্ডন শহরে চিকিৎসাকেন্দ্র খুলে বসেন। বহু রোগী জুটে যায়। ফলে মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান তিনি।

রোগীদের পরীক্ষা করে হারভে যা দেখতেন—সবই সাবধানতার সঙ্গে একটি নোট বইতে লিখে রাখতেন। অবসর সময়ে জীবজন্তু নিয়ে তিনি পরীক্ষাকার্য চালাতেন। পাখি, ব্যাঙ, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীর দেহ-ব্যবচ্ছেদ করে তিনি তাদের রক্তনালী পরীক্ষা করে জ্ঞান আহরণ করতেন। এইভাবে পরীক্ষা করতে করতে এক সময় হারভে দেখলেন যে, শিরাতে যে ভাল্‌বগুলি আছে সেগুলি হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে খোলা এবং ধমনীতে যে ভাল্‌বগুলি আছে সেগুলি হৃদ্‌যন্ত্র থেকে বাইরে যাবার দিকে খোলা। অনেক পরীক্ষার পর হারভে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, শিরার রক্ত সর্বদা হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে চালিত হয়, আর ধমনীর রক্ত সব সময় হৃদ্‌যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে। হারভে আরও দেখলেন যে, হৃদ্‌যন্ত্র একটি ফাঁপা মাংসপেশী বিশেষ এবং রক্তকে পাম্প করাই তার কাজ। যখন হৃদ্‌যন্ত্র পুরো সংকুচিত হয় তখন তার থেকে প্রায় দু' আউন্স রক্ত ধমনী বেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সংকোচনের পরই হৃদ্‌যন্ত্রের প্রসারণ শুরু হয়। তখন শিরা বেয়ে রক্ত ধাবিত হয় হৃদ্‌যন্ত্রের দিকে। আবার হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন ঘটে।

এমনিভাবে হৃদ্‌যন্ত্র সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে অবিরাম পাম্পের মত কাজ করে যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচনের ফলে পাম্প করা রক্তের বর্ধিত চাপ নাড়ী টিপে বোঝা যায়। হারভে নাড়ী টিপে ধরে প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন কত তা গুণে নিয়ে হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন নির্ণয় করতে সক্ষম হন। এইভাবে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে রোগ নির্ণয় করার ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ হলেন 'উইলিয়াম হারভে'।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় হারভে দেখেছিলেন যে, পূর্ণবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দন মিনিটে ৬০ থেকে ৯০ বার হয়। তিনি অঙ্ক কষে বের করেছিলেন যে, হার্ট প্রতিঘণ্টায় ৬৫ গ্যালন পরিমিত রক্তকে পাম্প করতে সক্ষম। কিন্তু আমাদের দেহে রক্তের পরিমাণ তার চাইতে কম—বড় জোর চার কি পাঁচ কোয়ার্ট। এক কোয়ার্ট প্রায় তিন পোয়ার সমান। তাহলে হার্ট যে অবিরাম পাম্প করে চলেছে—সেটা কোন্ রক্ত? হারভে সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমাদের শরীরের ঐ চার বা পাঁচ কোয়ার্ট রক্তই চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। রক্ত হার্ট থেকে বেরিয়ে ধমনীর ভেতর দিয়ে সঞ্চরণ করে ও শিরা বেয়ে আবার হার্টেই ফিরে আসে। ধমনীর ভাল্‌ব রক্তকে হার্ট থেকে বের করে দেয়, আর শিরার ভাল্‌ব রক্তকে হার্ট-এর দিকে সঞ্চালিত করে।

বার বার পরীক্ষা করে হারভে যখন নিশ্চিত হলেন যে, রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল, তখনই তিনি পুস্তকাকারে তা' প্রকাশ করলেন। বইটির নাম দিলেন 'ট্রিটিজ অন্ দি মোশান অফ দি হার্ট অ্যাণ্ড ব্লাড'। এই বইখানি চিকিৎসাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। নতুন এই চিন্তাধারাকে বহু চিকিৎসক পুরনো সংস্কারের বশবর্তী হয়ে মেনে নিতে চাইলেন না। কিন্তু শেষে জয় হলো সত্যের। রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে হারভের সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হলো।

আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। মানুষ আজ সুস্থ লোকের শিরা থেকে রক্ত নিয়ে তা রুগ্ন লোকের দেহে সঞ্চারিত করে রোগীকে বাঁচাতে সক্ষম হচ্ছে। শুধু কি তাই—হার্ট অপারেশন করার সময় মেশিনের সাহায্যে রোগীর দেহের রক্ত চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক করে রাখতে পারছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এই অসামান্য অগ্রগতির মূলে আছে রক্তসঞ্চালন সম্পর্কে উইলিয়াম হারভের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।

—
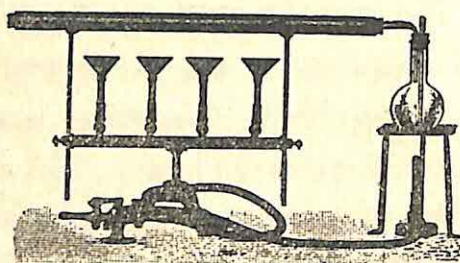
অ্যাণ্টন ভ্যান লিউয়েনহুক

(খ্রীষ্টাব্দ ১৬৩২—১৭২৩)

হল্যাণ্ডের একটি শহর।

নাম তার 'ডেল্‌ফ্‌ট'।

এই শহরে অনেকদিন আগে অ্যাণ্টন ভ্যান লিউয়েনহুকের একটি দোকান ছিল। ছোটখাট দোকান ঘর। আলো-বাতাস তেমন ঢোকে না। ঘরে প্রচণ্ড গরম।

সেই গরম দোকান ঘরটিতে একদিন বেশ ভিড় জমলো। জনা এগারো লোক এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন পুরোহিত, একজন দলিল সাব্যস্তকারী রাজকর্মচারী, বাদবাকিরা ডেল্‌ফ্‌ট শহরবাসী গণ্যমান্য লোক।

একে একে তাঁরা দোকান ঘরের জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন। হাতে তুলে নিলেন লিউয়েনহুকের তৈরি একখানি লেন্স। আর তাই চোখের সামনে ধরে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন একটি পাত্রের অভ্যন্তরে জীবাণুদের অদৃশ্য জগৎ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এইসব জীবাণুরা এতদিন ছিল মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। লিউয়েনহুকই প্রথম মানুষ—যিনি তাঁদের দেখলেন চোখে লেন্স লাগিয়ে। আর ঐ এগারোজন মানুষকেও লিউয়েনহুক জীবাণুদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখবার সুযোগ দিলেন।

খালি চোখে যাদের দেখা যায় না, যন্ত্রের সাহায্যে তাদের দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন ওঁরা। লিউয়েনহুক তাঁর আবিষ্কৃত লেন্সের সাহায্যে অদৃশ্য জীবাণু-জগতের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তাঁদের দেখাতে সমর্থ হয়েছেন—এইটুকু একটা কাগজে লিখে তাতে সই করে দিলেন ওঁরা। সেই কাগজখানার সঙ্গে একটা চিঠি লিখে লিউয়েনহুক তাঁর এই আবিষ্কারের বিবরণ পাঠিয়ে দিলেন লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে। সেটা ১৬৭৪ সালের কথা। রয়্যাল সোসাইটির বিজ্ঞানীরা সেদিন উপলব্ধি করলেন যে, লিউয়েনহুকের তৈরি এই লেন্স—ভবিষ্যতে এক বিরাট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইঙ্গিত বহন করছে।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের ঐ ডেল্‌ফ্‌ট শহরেই লিউয়েনহুকের জন্ম হয়। আমস্টারডামের এক দোকানে কিছুকাল শিক্ষানবিশী করার পর ডেল্‌ফ্‌ট শহরে তিনি নিজেই একটা দোকান খুলে বসেন। দোকানে কাজের ফাঁকে তিনি যেটুকু অবসর পেতেন সেই সময়টুকু ব্যয় করতেন বড় করে দেখার কাচ তৈরি করতে। লিউয়েনহুকের কারিগরী দক্ষতা ছিল খুব বেশী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তিনি কাচ ঘষে ঘষে লেন্স তৈরী করতেন। উদ্দেশ্য—খুব ছোট জিনিসকে বড় করে দেখার উপায় আবিষ্কার করা। খালি চোখে যাদের দেখা যায় না—তাদের যন্ত্রের সাহায্যে দেখা।

অবশেষে লিউয়েনহুকের মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। এমন লেন্স তিনি তৈরি করলেন—যার সাহায্যে কোনো জিনিসকে তার চেয়ে দেড়শো গুণ বড় করে দেখা গেল। লেন্সটিকে তিনি ধাতুর ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিলেন। তাতে একটা হাতলও লাগিয়ে নিলেন। হাতল লাগানোর ফলে সেই লেন্স দিয়ে পরীক্ষার কাজ চালানোর সুবিধা হলো।

এতেই সন্তুষ্ট হয়ে চুপটি করে বসে রইলেন না লিউয়েনহুক। লেন্সযুক্ত ফ্রেমটার নীচে তিনি একটি আয়নাকে এমনভাবে স্থাপন করলেন, যাতে করে আয়নায় প্রতিফলিত আলো উপরের লেন্সের ভেতর দিয়ে চলে যায়। লিউয়েনহুক এই লেন্স আর আয়নার মাঝে রাখলেন একটা পরিষ্কার কাচের প্লেট। যে জিনিসটাকে পর্যবেক্ষণ করা দরকার, তা রাখার জায়গা হলো ঐ কাচের প্লেটখানা। এমনিভাবে তৈরি হয়ে গেল একটি সরল অণুবীক্ষণ-যন্ত্র। আর লিউয়েনহুক সেই যন্ত্রের সাহায্যে নানান জিনিস পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। মাথার চুল, মাছির পা, গরুর চোখ, মাছের

আঁশ, গাছের পাতা ও আরও কত কি নিয়ে তিনি পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। লক্ষ্য করে যেতে লাগলেন—ঐসববের গঠন-বৈচিত্র্য। শুধু লক্ষ্য করেই ক্ষান্ত হলেন না। প্রত্যেকটির চিত্র এঁকে গঠনগত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে তার গায়ে 'লেবেল' এঁটে দিলেন। লেবেলে লিখে দিলেন জিনিসটার নাম। পরীক্ষার এসব বিবরণ লিউয়েনহুক নিয়মিতভাবে পাঠাতে লাগলেন লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে।

এরপর একদিন লিউয়েনহুকের জীবনে এল চরম মুহূর্ত। সেদিন তাঁর কি খেয়াল হলো কে জানে। গতানুগতিকভাবে বিভিন্ন কঠিন জিনিস নিয়ে পরীক্ষা না চালিয়ে তিনি সেদিন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাচের পাতে রাখলেন এক ফোঁটা বৃষ্টির জল। তারপর যন্ত্রের লেন্সের চোখ লাগিয়ে সেই জলটুকুকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ঐ এক ফোঁটা জলে লিউয়েনহুক দেখলেন—হাজার হাজার ক্ষুদে পোকাকে কিলবিল করে বেড়াতে। লিউয়েনহুক ঐ ক্ষুদে পোকাদের নাম দিলেন 'কীটাণু'।

বিভিন্ন ধরনের কীটাণুর সন্ধান পেলেন লিউয়েনহুক। তিনি তাদের গঠন-বৈচিত্র্য খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখলেন। আজ আমরা যাদের 'ব্যাকটিরিয়া', 'মাইক্রোব' ইত্যাদি নামে অভিহিত করে থাকি—লিউয়েনহুক তাদেরই নাম দিয়েছিলেন 'কীটাণু'। আর তাঁর চোখেই এরা প্রথম ধরা পড়েছিল।

এরপর লিউয়েনহুক ভাবতে লাগলেন—বৃষ্টির জলে 'কীটাণু' এল কি ভাবে?—এর সদুত্তর খুঁজে পাবার জন্যে তিনি আবার পরীক্ষা শুরু করলেন। একটি পাত্রকে তিনি খুব ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিলেন। আর তাতেই ধরলেন কিছুটা বৃষ্টির জল। বেশ কিছুক্ষণ বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর ঐ জলটা ধরলেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সেই জলে কোনো ব্যাকটিরিয়া নেই। কিন্তু ঐ জল পাত্রে কিছুদিন রেখে দেওয়ার পর যখন তাতে ধুলো-ময়লা জমল, তখন লিউয়েনহুক সেই জলেই দেখতে পেলেন অজস্র ব্যাকটিরিয়া।

লিউয়েনহুকের বৈজ্ঞানিক মন এতেও সন্তুষ্ট হলো না। তিনি একে একে খাল, বিল, পুকুর, নদী, ছাদের কার্নিশ প্রভৃতি স্থানের জল সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে,

বায়ুতে আছে জীবাণু। ধূলিকণার ওপর সেই জীবাণু গিয়ে পড়ে। আর বায়ু ও ধূলিকণা দ্বারা জল দূষিত হয়।

লিউয়েনহুক অদৃশ্য জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করতে চান। তাই হাতের কাছে যা পান, তাই পরীক্ষা করে দেখেন। নিজের আঙুলে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে তিনি রক্ত বের করলেন। এক ফোঁটা রক্ত অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে পরীক্ষা করলেন। দেখলেন—রক্তে রয়েছে লাল রঙের অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ—যাদের আমরা বলি 'লোহিত কণিকা'। এদের জন্যেই রক্তের রঙ হয় লাল। এ ভিন্ন তিনি নিজের দাঁতের ওপরকার পাতলা আবরণটা চেঁছে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সেটাও ব্যাকটিরিয়ায় ভরা। এরপর ছোট্ট একটা মাছের লেজ পরীক্ষা করলেন লিউয়েনহুক। দেখলেন যে, সেটা রক্তবাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীতে ভরা। আর এদের মধ্য দিয়েই রক্ত ধমনী থেকে শিরায় যায়।

এমনিভাবে লিউয়েনহুক একের পর এক নতুন নতুন জিনিস পরীক্ষা করে চললেন। দেখলেন ঈষ্ট, নার্ভতন্তু, মাংসপেশীর গঠন ও আরও কত কি! অদৃশ্য জগতের অজস্র অজানা তথ্য আবিষ্কারের জন্যে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হলেন লিউয়েনহুক। তাঁর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর কাছে এলেন ইংলণ্ডের রাণী, জার্মানীর সম্রাট, রাশিয়ার জার ও আরও অনেকে। ওঁদের সবাইকেই লিউয়েনহুক দেখালেন ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়াকলাপ ও অদৃশ্য জগতের অনেক অদ্ভুত দৃশ্য। ওঁরা মুগ্ধ হলেন লিউয়েনহুকের কৃতিত্বে।

বয়স বেড়ে চলল, কিন্তু ক্লান্তি নেই লিউয়েনহুকের। প্রায় ৮০ বছর বয়সে তিনি আর এক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করলেন। ডেল্‌ফ্‌ট-এর এক খাল থেকে তিনি কয়েকটা শুক্তি নিয়ে এসে একটি গ্লাসের জলে কয়েকদিন রেখে দিলেন। কিছুকাল পরে অবাক বিস্ময়ে লিউয়েনহুক দেখলেন যে, জলের ব্যাকটিরিয়ারা শুক্তিগুলোকে খেয়ে ফেলেছে। এ এক তাজ্জব ব্যাপার। অত ছোট যে ব্যাকটিরিয়া—তারাও তাদের চেয়ে আকারে বহুগুণ বড় জীবন্ত প্রাণীকে বিনষ্ট করে ফেলল। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক লিউয়েনহুক সেইদিন ঘোষণা করলেন যে, জীবাণুর সাহায্যে আবর্জনা বিনষ্ট করা সম্ভব।

সারা জীবন ধরে অদৃশ্য জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করার পর ৯১ বছর

বয়সে লিউয়েনহুক ইহলোক ত্যাগ করলেন। মাথার বালিশের একপাশে রেখে গেলেন তাঁর সাধের অনুবীক্ষণ যন্ত্রটিকে। সামান্য একজন দোকানদার কিভাবে অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা জীবাণু বিদ্যায় পথিকৃতের দুর্লভ সম্মান অর্জন করতে পারেন—তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন লিউয়েনহুক।

—

আইজাক নিউটন

(খ্রীষ্টাব্দ ১৬৪২—১৭২৭)

গরিবের ছেলে। বাপ নেই।

মা তাই ছেলেকে ক্ষেতের কাজকর্ম দেখাশুনা করতে বললেন। মায়ের আদেশ অমান্য করতে পারে না ছেলে। সে ক্ষেতে যায় কিন্তু কাজ করে না। তবে কি করে?

—গাছের ছায়ায় বসে বই খুলে পড়ে আর আঁক কষে। গোরু, ভেড়া ক্ষেতে ঢুকে ফসল নষ্ট করে কিন্তু ছেলেটির তা নজরে পড়ে না। তন্ময় হয়ে সে বই পড়ে।

একদিন ঝড় উঠলো।

ঝড়ের দমকা হাওয়ায় বই-খাতা কোথায় যে উড়ে চললো তা ছেলেটি খেয়াল করলো না। সে তখন আপন মনে বাতাসের গতি মাপছে। একবার বাতাসের গতির দিকে লাফাচ্ছে। মেপে দেখছে, কতটা লাফালো। তারপর আবার বাতাসের গতির বিপরীত দিকে লাফাচ্ছে।

মেপে দেখছে—এবার সে কতটা লাফালো। এমনিভাবে খেলার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রহস্য জানবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ছেলেটি।

কিন্তু কে এই খেয়ালী ছেলেটি?

ইনিই নিউটন। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন। ১৬৪২ সালে ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের লিঙ্কনশায়ারের অন্তর্গত 'উল্সথর্প' নামক এক ছোট্ট গ্রামে এঁর জন্ম হয়। জন্মের মাত্র কয়েক মাস আগে এঁর বাবা মারা যান। তখন দিদিমা এঁকে কাছে নিয়ে গিয়ে মানুষ করতে থাকেন।

বারো বছর বয়সে নিউটনকে ভর্তি করা হয় গ্রান্থামে 'কিংস স্কুলে'। স্কুলে ছাত্র হিসাবে তিনি খুব যে একটা ভাল ছিলেন, তা নয়। তবে তাঁর ঐ বয়সেই মস্ত বড় একটা গুণ ছিল। ঘরে বসে আপন মনে করাত, বাটালি, হাতুড়ি ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে তিনি নানারকম সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করতে পারতেন। বালক নিউটন একটি ছোট্ট উইণ্ড মিল বা বায়ুচালিত কল তৈরি করেছিলেন। ছোট্ট হলেও সবদিক থেকে নিখুঁত সেটি। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, একটি ইঁদুরকে ঐ কল চালাবার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন নিউটন। ঐ কলে এক-আধ মুঠো গম পেষাও যেতো।

শুধু কি উইণ্ড মিল?—সূর্য-ঘড়ি, জল-ঘড়ি ও আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তিনি তৈরি করেছিলেন। এসব দেখে পাড়া-পড়শী অনেকেই তখন বলেছিলেন—আইজাক বড় হলে খুব ভাল কারিগর হবে। ওর ভবিষ্যতের জন্যে কাউকে চিন্তা করতে হবে না।

হ্যাঁ, ওঁদের অনুমান মিথ্যা হয়নি, আইজাক ভাল কারিগর তো হয়েছিলেনই। বড় হয়ে তিনি আয়নাযুক্ত এক নতুন ধরনের দূরবীনযন্ত্র বানিয়েছিলেন। তাঁর দূরবীনের মডেল অনুসারেই পরবর্তীকালে বানানো হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ার মাউণ্ট পালামোর মানমন্দিরের প্রতিফলন-টেলিস্কোপটি।

আমরা কিন্তু আইজাক নিউটনকে যন্ত্রবিদ্ বা কারিগর আখ্যা দেবো না। কারণ যন্ত্রবিদ্ হিসাবে যে দক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। আমরা তাই নিউটনকে জানি বিশ্ববিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক রূপে।

আইজাকের মা দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী মারা গেলে পর তিনি দিদিমার কাছ থেকে ছেলেকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখেন। সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না বলে, তিনি ছেলেকে আর লেখাপড়া না শিখিয়ে চাষ-আবাদের কাজে লাগান। কিন্তু তাঁর আশা সফল হলো না। চাষ-আবাদের কাজে ছেলের মন বসলো না। তাই বাধ্য হয়ে মা আবার আইজাককে পড়তে বললেন। আইজাক এবার ভর্তি হলেন কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। বয়স তখন তাঁর উনিশ বছর।

এইবার আইজাকের জীবনের মোড় ঘুরলো। এই কলেজে ভর্তি হবার পর জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি বই তাঁর হাতে এল। সেই বইতে গ্রহ-নক্ষত্র ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য ইত্যাদি অনেক কিছুই লেখা ছিল। বইখানি পড়ে আইজাক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হলেন। তিনি বুঝলেন যে, জ্যামিতি ভালভাবে না শিখলে জ্যোতির্বিজ্ঞান বোঝা খুব শক্ত হয়ে পড়ে। আইজাক তাই প্রথমে ইউক্লিড ও পরে ডেকার্টের জ্যামিতি ভালভাবে পড়ে ফেললেন। জ্যামিতি পড়তে গিয়ে তিনি অঙ্ক-শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বড় হয়ে তিনি আবিষ্কার করলেন 'গতির সূত্র'। গতির সূত্র তিনটি। তিনটিই গাণিতিক সূত্র। যে শক্তিগুলি বস্তুকে গতি দেয় তার ব্যাখ্যা, যে শক্তিগুলি তাদের থামিয়ে দেয় তার ব্যাখ্যা এবং তাদের গতির দিক ও বেগের হার ব্যক্ত করেছে এই সূত্রগুলি।

কেম্ব্রিজে থাকাকালে নিউটন অনেক রাত জেগে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। আবার চাঁদ ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে। এসব কথা ঐ সময়কার মানুষ জানতো। কিন্তু কেন ঘোরে? তার উত্তর মানুষের জানা ছিল না। নিউটনই সর্বপ্রথম এর কারণ বের করে বিজ্ঞান-জগতে এক নতুন তথ্য প্রকাশ করলেন। নিউটন বললেনঃ পৃথিবীর একটি স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আছে। সেই শক্তির বলেই পৃথিবী সমস্ত জিনিসকে তার কেন্দ্রের দিকে টানে। এই আকর্ষণী শক্তির নাম 'মাধ্যাকর্ষণ'। আবার প্রত্যেক জিনিসেরই পরস্পরকে আকর্ষণ করবার একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে। বস্তুর আয়তন এবং তাদের উভয়ের দূরত্বের উপরই আকর্ষণ করবার এই শক্তি নির্ভর করে। একটি দড়িতে ঢিল বেঁধে যদি ঘোরানো যায়, তাহলে সেটি বৃত্তাকারে ঘুরবে।

দড়ির আকর্ষণেই ঢিলটি বৃত্তাকারে ঘুরবে। সূর্যের এই রকম আকর্ষণী শক্তি আছে বলেই পৃথিবী তার চারদিকে লাটিমের মত ঘুরছে এবং চাঁদও তেমনি ভাবে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহও একই নিয়ম মেনে চলছে। আর এই আকর্ষণের জন্যই মহাশূন্যে অবস্থান করেও ওরা কক্ষচ্যুত হচ্ছে না।

আলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করে নিউটন বিশ্ববাসীকে জানালেন যে, সূর্যের আলো আপাতদৃষ্টিতে সাদা বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা সাদা নয়। ঐ সাদা আলো সাতটি রঙের আলোর সমষ্টি।

একটি প্রিজমের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি পাঠালে তা ঐ সাতটি রঙের রশ্মিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আলোকতত্ত্ব ভিন্ন তিনি জোয়ার-ভাঁটার নিয়ম-সূত্র আবিষ্কার করেন। আবিষ্কার করেন 'ক্যালকুলাস' নামে এক নতুন রীতির গণিতশাস্ত্র। ১৮৬৭ সালে নিউটন তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া' প্রকাশ করেন। সেই বইতে তিনি বলেন যে, বিশ্বের পদার্থের প্রতিটি অণু বিশ্বের পদার্থের অপর প্রতিটি অণু দ্বারা আকৃষ্ট হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন নিউটন। তাই বলা হয়—তিনি নাকি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান পুরুষ।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার নিউটনকে ট্যাঁকশালের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। ১৭০৩ সালে তিনি ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি মনোনীত হন। ১৭০৫ সালে তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তখন থেকেই তিনি 'স্যার আইজাক নিউটন' নামে পরিচিত হন।

নিউটন ৮৫ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু জ্ঞানী ও কৃতী ব্যক্তি বলে তাঁর এতটুকু অহঙ্কার ছিল না কোনদিন। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি নাকি আক্ষেপ করে বলেছিলেনঃ আমার মনে হয়, আমি নিতান্তই বালকের মত জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে শুধু ঝিনুক আর নুড়ি কুড়িয়ে গেলাম, আমার সামনে সীমাহীন জ্ঞান-সমুদ্র তেমনই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল।

—
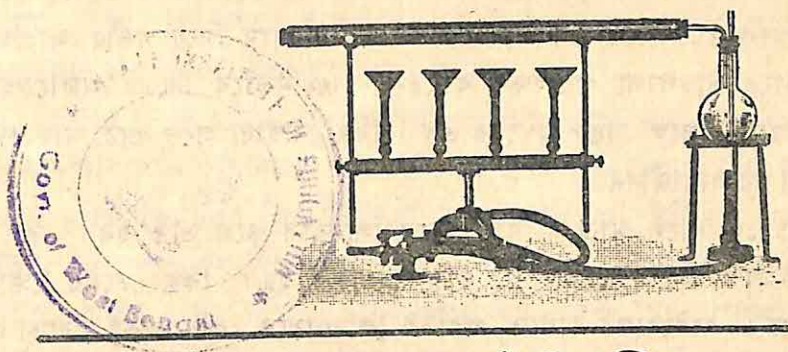
কার্ল লিনিয়াস

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭০৭—১৭৭৮)

জীবজগতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। কত রকমের উদ্ভিদ ও প্রাণী যে রয়েছে এ জগতে, তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীদের চেনবার সুবিধার জন্য তাদের কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন জীবের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য লক্ষ্য করেই প্রধানতঃ এই শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে। কাজটা যত সহজ মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু তা নয়। এর পেছনে রয়েছে বহু বিজ্ঞানীর বহু দিনের প্রচেষ্টা। তবে এই প্রচেষ্টায় যিনি সর্বতোভাবে প্রথম সাফল্য লাভ করেন তাঁর নাম 'কার্ল লিনিয়াস'। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তিনিই সর্বপ্রথম প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ল্যাটিন ভাষায় তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের নামকরণ করেছিলেন। তাঁর দেওয়া নাম এতই বিজ্ঞানসম্মত ও সরল যে, তা পৃথিবীর সর্বত্রই গৃহীত হয়েছে এবং আজও সেইসব নামই চলছে।

১৭০৭ সালে লিনিয়াস সুইডেন দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা 'নিল্‌স লিনে' ছিলেন ধর্মযাজক। ওঁর বাড়ির সামনে সুন্দর একটি বাগান ছিল। নিল্‌স লিনে তাঁর ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাগানে বেড়াতেন। বিভিন্ন গাছপালা দেখিয়ে তাদের নাম বলে দিতেন। ফলে অল্প বয়সেই লিনিয়াস গাছপালা সম্পর্কে খুব কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। উদ্ভিত জগতের

বৈচিত্র্য দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। আর সব ছেলে যখন খেলাধূলায় মত্ত থাকতো, বালক কার্ল লিনিয়াস তখন বাগানে গিয়ে গভীর আগ্রহ সহকারে গাছপালা পর্যবেক্ষণ করতেন। এমনিভাবে নিজের অজান্তেই লিনিয়াসের সঙ্গে উদ্ভিদ জগতের এক নিবিড় সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে আর তা স্থায়ী হয় সারাজীবন।

১৭১৬ সালে মাত্র ন' বছর বয়সে লিনিয়াস স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর বাবা-মা'র ইচ্ছা—ছেলেটি বড় হয়ে ধর্মযাজক হয়। কিন্তু ছেলের ইচ্ছা তা নয়। বাইবেলের চাইতে প্রকৃতিই লিনিয়াসকে বেশী আকৃষ্ট করতো। লিনিয়াস তাই একদিন তাঁর বাবা-মাকে স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দিলেন যে, তিনি ধর্মযাজক হতে চান না—চান প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হতে।

আশা ভঙ্গ হওয়ায় মনে আঘাত পেলেন বাবা-মা, কিন্তু তাঁরা ছেলেকে নিরুৎসাহিত করলেন না।

স্কুলের পাঠ শেষ করে লিনিয়াস উপ্‌শালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। উদ্ভিদ-বিদ্যা পড়তে লাগলেন। সেখানে তিনি অধ্যাপকরূপে পেলেন 'ওল্‌ফ্‌ রুডবেক্‌'কে। অধ্যাপক রুডবেক তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দিলেন ছাত্র লিনিয়াসকে। দেখতে দেখতে লিনিয়াস উদ্ভিদ-বিদ্যায় অসামান্য জ্ঞান আহরণ করে ফেললেন। ছেলেবেলা থেকেই লিনিয়াসের একটি বিশেষ গুণ ছিল। সেটি হচ্ছে—শোনা কথায় বিশ্বাস না করা। নিজের চোখে দেখেশুনে, হাতে-কলমে পরীক্ষা করে তবেই তিনি কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বত্রই লিনিয়াস ঐ একই পদ্ধতিতে পড়াশুনা করেন। ফলে অল্প বয়সেই তিনি উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিশারদ হয়ে ওঠেন।

অধ্যাপক রুডবেকের নির্দেশে ১৭৩২ সালে লিনিয়াস ল্যাপ্‌ ল্যাণ্ডে যান। সেখানে তিনি যান—ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য। সঙ্গে নেন ছোট্ট একটা চামড়ার ব্যাগ। তাতে রাখেন সামান্য কয়েকটা জামা-কাপড়, একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র, একটা দূরবীন, খাতা ও কলম। কোমরে ঝুলিয়ে নেন একটি তরোয়াল আর হাতে নেন একটি লাঠি। ব্যস্‌, এই ক'টি জিনিস নিয়েই ল্যাপল্যাণ্ডে লিনিয়াস হাজার হাজার মাইল পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান। দুর্গম পথে কত কষ্ট পেয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন প্রবল শীতে। অনেক সময় আকস্মিক

বিপদে তাঁর জীবনসংশয়ও হয়েছে। তবুও অসীম ধৈর্য ও আগ্রহ সহকারে লিনিয়াস তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করে গেছেন।

তখনও পর্যন্ত সুইডেনের লোকেরা ল্যাপল্যাণ্ডবাসীদের সম্পর্কে খুব কমই জানতো। লিনিয়াস তাঁর অভিযান শেষ করে উপ্‌শালায় ফিরে এসে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন রয়্যাল সোসাইটিতে। তাতে তিনি ল্যাপল্যণ্ডবাসীদের জীবনযাত্রার বিবরণ দেন। বিবরণ দেন—সে দেশের অজস্র প্রাণী, উদ্ভিদ ও খনিজ সম্পদের। সঙ্গে নিয়ে আসেন কত রকমের দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ। লিনিয়াসের রিপোর্ট পেয়ে সুইডিশ সরকার সেই প্রথম বুঝতে পারেন—প্রাকৃতিক সম্পদে কত সমৃদ্ধ তাঁদের দেশ। রিপোর্টে লিনিয়াস এই সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণেরও নির্দেশ দেন। আর সুইডিশ সরকার সে নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন।

ল্যাপল্যাণ্ড অভিযানের মধ্যেই লিনিয়াস প্রাণী ও উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগের সূচনা করেন। অভিযানের তিন বছর বাদে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল সম্বলিত পুস্তক 'Systema Naturae' প্রকাশিত হয়। লিনিয়াস প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদের দু'টি করে ল্যাটিন নাম দেন। প্রথম নামের প্রথম অক্ষর বড় হাতের হরফে লেখার নির্দেশ দেন। প্রথম নামটি সূচনা করবে প্রাণী বা উদ্ভিদটি কোন্ গণের (genus) অন্তর্ভুক্ত। আর দ্বিতীয় নামটির দ্বারা বোঝা যাবে—ঐ প্রাণী বা উদ্ভিদ কোন্ প্রজাতির (species)। লিনিয়াসের পদ্ধতি অনুসারে আগে 'গণ' ও পরে 'প্রজাতি' ঠিক করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে লিনিয়াস তাঁর আবিষ্কৃত উদ্ভিদ বা জীবের নামের সঙ্গে তাঁর নিজের নামের আদ্যক্ষর 'L' যুক্ত করে গেছেন। লিনিয়াস কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ-পদ্ধতি সারা বিশ্বে গৃহীত হয়। ফলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে থাকে। ১৭৩৮ সালে লিনিয়াস প্যারিসে যান। হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশও তিনি ঘুরে আসেন।

এরপর লিনিয়াস চলে যান হল্যাণ্ডে। সেখানে গিয়ে তিনি ডাক্তারী পড়ে ডাক্তার হয়ে ফিরে আসেন সুইডেনে। দেশে ফিরে এসে ১৭৩৯ সালে তিনি বিয়ে করেন এবং চিকিৎসকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। তিনি সুইডেনের রাণীর ব্যক্তিগত চিকিৎসকও নিযুক্ত হন। কিছুদিনের মধ্যেই ডাক আসে উপ্‌শালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। লিনিয়াস ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে

ভেষজ ও উদ্ভিদ-বিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক হিসাবেও লিনিয়াস যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র তাঁর কাছে পড়তে আসতো। তিনি ছাত্রদের শুধু বই পড়িয়েই ক্ষান্ত হতেন না। বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাদের গাছপালা চিনতে শেখাতেন।

১৭৭৮ সালে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই প্রকৃতি-বিজ্ঞানী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

—
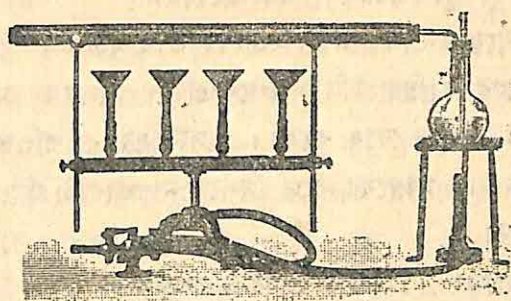
হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩১—১৮১০)

লণ্ডন শহরে তখন সবে সন্ধ্যা নেমেছে।

হাল ফ্যাশানে একটি বাড়ির পিছনের দরজা হঠাৎ খুলে গেল। দরজায় ছায়ার মত একটি মূর্তির আবির্ভাব ঘটলো। পরনে তাঁর সেকেলে ধরনের পোশাক।

ছায়ামূর্তি একবার রাস্তার এদিক, আর একবার ওদিক বেশ ভালভাবে তাকিয়ে দেখে নিলেন। দেখে নিলেন—কাছেপিঠে কেউ আছে কিনা। যখন বুঝলেন যে, রাস্তা সত্যিই জনশূন্য হয়েছে, তখনই তিনি বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—নিরিবিলিতে একটু সান্ধ্য-ভ্রমণ।

একটু যেতে না যেতেই রাস্তার বাঁকের কাছে ছায়ামূর্তি অপ্রত্যাশিত-ভাবে সম্মুখীন হলেন একখানি গাড়ির। ঐ গাড়ির মধ্যে ছিলেন দু'জন ভদ্রমহিলা। রাস্তার ধারে গ্যাসের আবছা আলোয় ঐ মহিলা দু'জন চিনে ফেললেন ছায়মূর্তিকে। আর অমনি বলে উঠলেন: 'নমস্কার মিস্টার ক্যাভেণ্ডিশ।'

মিস্টার ক্যাভেণ্ডিশ!

খুনী নয়, চোর নয়, গুপ্তচর নয়—ছায়ামূর্তি কি তবে বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদ্ হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ?—হ্যাঁ তাই, কিন্তু রাতের অন্ধকারে এ

ভাবে চুপিচুপি বেরুনোর কি প্রয়োজন ?

প্রয়োজন কিছু নয়। ঐটাই তাঁর স্বভাব। লোকজনের, বিশেষ করে মেয়েদের সান্নিধ্য উনি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেন। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে সঙ্কোচ বোধ করেন। সেটা ধনী বা পণ্ডিত ব্যক্তি বলে অহঙ্কারের জন্য নয়। মানুষের সঙ্গে মিশতে না পারাটা তাঁর দোষ—তাঁর মানসিক অক্ষমতা।

বাড়ির ঠাকুর-চাকরের সম্মুখীন হতেও সঙ্কোচ বোধ হতো ক্যাভেণ্ডিশের। তাই রোজ সকালে একটি কাগজে লিখতেন—সেদিন কি কি খেতে চান। লেখা কাগজটাকে তারপর তিনি সবার অলক্ষ্যে ঠাকুর-চাকরদের ঘরে ফেলে দিয়ে আসতেন। তারা সময়মত খাবার রেখে দিয়ে আসতো মনিবের খাবার টেবিলে। বাড়ির পেছন দিকে ছিল একটি সিঁড়ি। পেছনের সেই সিঁড়ি বেয়েই ক্যাভেণ্ডিশ ওঠানামা করতেন। সদর দরজা বা সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত করতেন না। এমনই লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ক্যাভেণ্ডিশ !

১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশে হেনরী ক্যাভেণ্ডিশের জন্ম হয়। মাত্র দু'বছর বয়সে ক্যাভেণ্ডিশ তাঁর মাকে হারান। বাল্য-কালে একটি বোর্ডিং-স্কুলে লেখাপড়া সেরে তিনি কেম্ব্রিজে যান উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। কেম্ব্রিজ ছেড়ে ক্যাভেণ্ডিশ প্যারিসে যান পড়াশুনার জন্য। তারপর ফিরে আসেন স্বদেশে—ইংলণ্ডে।

লেখাপড়ায় ক্যাভেণ্ডিশের পারদর্শিতার তুলনা হয় না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গভীর অনুরাগ ছিল তাঁর। পিতা লর্ড চার্লস ক্যাভেণ্ডিশ পুত্রকে প্রায়ই নিয়ে যেতেন লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে। বালক হেনরী সেখানে বিজ্ঞানের নানান পরীক্ষা দেখতেন এবং উৎসাহবোধ করতেন। ঐ সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করতো। বিজ্ঞানের প্রতি পুত্রের গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করে লর্ড ক্যাভেণ্ডিশ তাঁর বাড়িতেই একটি ছোটখাট পরীক্ষাগার তৈরি করে দিয়েছিলেন। বালক হেনরী সেইখানে বসে আপন মনে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন।

ক্যাভেণ্ডিশ যে যুগের মানুষ সে-যুগে 'ফ্লোজিষ্টন তত্ত্ব' ছিল বহুল প্রচারিত। এ তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা বলতেন—সকল দাহ্য বস্তুতেই 'ফ্লোজিষ্টন' নামে একটি দাহ্য পদার্থ বর্তমান। ফ্লোজিষ্টন নিঃশেষ

হয়ে গেলে বস্তুর দহনও বন্ধ হয়।

হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ এই ফ্লোজিষ্টনকে পৃথক করার এবং তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে টিন, দস্তা এবং লোহা প্রভৃতি ধাতুর উপর লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড অথবা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢেলে তিনি একটি বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন করেন। গ্যাসটি বায়ু অপেক্ষা হাল্কা এবং বায়ুতে দহন করলে সেটি নীলাভ শিখায় জ্বলে। এই দাহ্য গ্যাসটিই বুঝি 'ফ্লোজিষ্টন'—এই ভেবে ক্যাভেণ্ডিশ ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এই গবেষণার ফল জানান ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটিকে।

ক্যাভেণ্ডিশ যে গ্যাসটি আবিষ্কার করেছিলেন তা 'ফ্লোজিষ্টন' নয়। পরে জানা গেল—ওর নাম 'হাইড্রোজেন'। যাই হোক, ঐ অজ্ঞাত গ্যাসটির অনেক মজাদার ধর্মের পরিচয় পেয়ে তখন অনেকে জাদু প্রদর্শনী খুলে বেশ দু'পয়সা লুটতে লাগলেন। কাগজের ব্যাগে ঐ গ্যাসটি পুরে ছেড়ে দিলে ব্যাগটি আকাশে উঠে যায়—এ খেলা দেখিয়ে অনেক জাদুকর দর্শকদের মন জয় করতে লাগলেন। বায়ুর উপস্থিতিতে এ গ্যাসটিকে আগুনের শিখার সংস্পর্শে নিয়ে এসে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিতে লাগলেন।

বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিশ কিন্তু গ্যাসটির এইসব মজাদার ধর্ম লক্ষ্য করে অবাক হলেন তখনই—যখন দেখলেন যে, বায়ুতে ঐ গ্যাসটিকে দহন করলে একটি স্বচ্ছ তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়।

ঐ তরল পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ জানবার উদ্দেশ্যে ক্যাভেণ্ডিশ তখন ঐ গ্যাসের সঙ্গে মেশালেন অক্সিজেন। সেই মিশ্রণকে একটি কাচ-গোলকে পুরে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটালেন। তারপর অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, কাচ-গোলকের ভেতরকার গায়ে সঞ্চিত হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ তরল কণা।

ক্যাভেণ্ডিশ আউন্স খানেক ঐ তরল পদার্থ উৎপন্ন করলেন। তারপর ঐ তরলের ধর্ম নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে, ওটি বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন স্বচ্ছ তরল পদার্থ। ঐ তরলকে বাষ্পীভূত করলে কোনো তলানি পড়ে থাকে না। শুধু তাই নয়—নির্দিষ্ট আয়তনের জল আর ঐ তরলের ওজন একই। তবে কি ঐ তরল পদার্থটি 'জল'?—হ্যাঁ, অনেকবার পরীক্ষা

চালিয়ে ক্যাভেণ্ডিশ সেই সিদ্ধান্তেই পোঁছলেন।

এতদিন পর্যন্ত জল মৌলিক পদার্থ বলে বিবেচিত হতো। ক্যাভেণ্ডিশ প্রমাণ করলেন যে, জল মৌলিক পদার্থ নয়। ওটি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি যৌগ। দু' আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেনকে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে বিস্ফোরিত করলে জল উৎপন্ন হয়।

হাইড্রোজেন আবিষ্কার—নিঃসন্দেহে ক্যাভেণ্ডিশের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। কিন্তু এ ছাড়াও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরও অনেক অবদান আছে ক্যাভেণ্ডিশের। নাইট্রিক অ্যাসিড আবিষ্কারও তাঁরই।

ক্যাভেণ্ডিশ যে শুধু মানী বিজ্ঞানী ছিলেন তা নয়, ছিলেন ধনীও। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ধনসম্পদ একত্রিত করে গড়ে ওঠে বৃটেনের বিখ্যাত 'ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরী'। সেখানে তরুণ বিজ্ঞানীরা ব্রতী হন জ্ঞানান্বেষণে—অজানাকে জানবার সন্ধানে।

—
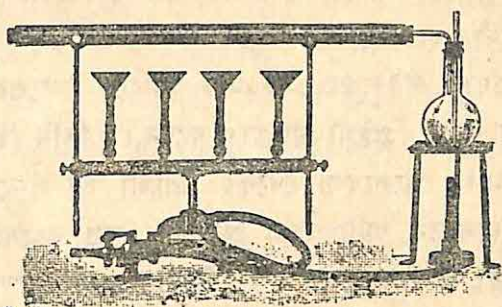
জোসেফ প্রিষ্টলী

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩৩—১৮০৪)

লণ্ডনের একটি ছোট সভাগৃহে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী 'বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন' তড়িৎ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা সবেমাত্র শেষ করেছেন। বক্তৃতা শেষে শ্রোতারা তাঁকে ঘিরে নানা রকম প্রশ্ন করছেন। কেউ বা জানাচ্ছেন অভিনন্দন।

এমন সময় শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এক যুবক এগিয়ে এলেন। পেশায় তিনি ধর্মযাজক। বললেনঃ তড়িৎ সম্পর্কিত আপনার পরীক্ষাগুলি আমাকে মুগ্ধ করেছে। তড়িৎশক্তি সম্পর্কে আরও বেশী তথ্য, আরও নতুন তথ্য আমি জানতে চাই। কি ভাবে তা জানতে পারি, বলুন তো ?

বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্কলিন প্রশ্নকর্তার নাম জানতে চাইলেন। উত্তরে সেই যুবক বললেনঃ আমার নাম 'জোসেফ প্রিষ্টলী'। তখন ফ্র্যাঙ্কলিন ঐ তরুণ ধর্মযাজকের সঙ্গে করমর্দন করে বললেনঃ বেশ তো, আপনি যদি তড়িৎ সম্পর্কে আরও নতুন নতুন তথ্য জানতে আগ্রহী হন, তাহলে আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

ধর্মযাজক প্রিষ্টলী বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ফ্র্যাঙ্কলিনও সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন যুবকের কৌতূহল মেটাতে। আর তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছিল 'তড়িতের ইতিহাস'। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জোসেফ প্রিষ্টলীর প্রথম অবদান।

আর এই অবদানের জন্যই প্রিষ্টলী ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন।

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে ইংলণ্ডের 'ফিল্ডহেড' নামক একটি ছোট শহরে প্রিষ্টলী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এক দরিদ্র তাঁতীর সন্তান। ছেলেবেলা থেকেই প্রিষ্টলী বই পড়তে ভালবাসতেন। আর ভালবাসতেন ধর্মালোচনা শুনতে। অল্প বয়সেই তিনি ল্যাটীন, গ্রীক, ফরাসী, জার্মান, এমনকি আরবী ভাষা পর্যন্ত আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী না থাকলেও রসায়নবিদ্যার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল প্রিষ্টলীর। রসায়নবিদ্যার অনেক বই তিনি পড়ে ফেলেছিলেন। গ্যাসীয় পদার্থ নিয়ে তিনি অনেক পরীক্ষা করেছিলেন। লীড্স-এ তাঁর বাড়ির কাছে মদ প্রস্তুতের একটি কারখানা ছিল। সেখানে মদের ভাটি হতে গ্যাস বেরুতো। ঐ গ্যাস প্রিষ্টলীর মনে কৌতূহল জাগালো। কৌশলে তিনি সেই গ্যাস সংগ্রহ করলেন। পরীক্ষা করে দেখলেন যে, জ্বলন্ত কাঠি ঐ গ্যাসের সংস্পর্শে নিয়ে গেলে নিভে যায়। কিছুকাল আগে 'জোসেফ ব্ল্যাক' ঐরকম ধর্মসম্পন্ন একটি গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'ফিক্সড্ এয়ার'। প্রিষ্টলীর ধারণা হলো যে, মদের ভাটি থেকে নির্গত এ গ্যাসটাও বোধহয় সেই 'ফিক্সড এয়ার'।

ভেবেই ক্ষান্ত হলেন না প্রিষ্টলী। বাড়িতে বসে খড়িমাটিকে সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত করে সেই 'ফিক্সড এয়ার' তিনি প্রস্তুতও করলেন। জলের মধ্য দিয়ে সেই গ্যাসটা পরিচালনা করে তিনি 'স্পার্ক্লিং ওয়াটার' প্রস্তুত করলেন। এই কৃতিত্বের জন্য তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি থেকে 'কোপ্লে পদক' লাভ করলেন। 'ফিক্সড এয়ার' আসলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। এই গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করেই তৈরি হয় 'সোডা ওয়াটার'। তখনকার দিনে এই সোডা ওয়াটারকেই বলা হতো 'স্পার্ক লিং ওয়াটার'।

প্রিষ্টলী বাড়িতে তাঁর ছোটখাট রসায়নাগারে বসেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। সাধারণ লবনকে সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে উত্তপ্ত করে তিনি একটি গ্যাস উৎপন্ন করলেন। উৎপন্ন গ্যাসকে পারদ অপসারণের দ্বারা সংগ্রহ করে তিনি তার ধর্ম নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। পাওয়া গেল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস। এই গ্যাসকেই জলে দ্রবীভূত

করে পাওয়া গেল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। শুধু হাইড্রোজেন ক্লোরাইডই নয়, একে একে তিনি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ও আরও অনেক গ্যাস আবিষ্কার করে চললেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো 'গ্যাসদ্রোণী', যার ইংরেজী নাম হলো 'নিউম্যাটিক ট্রাফ'। এ জিনিসটি আবিষ্কার করার ফলে গ্যাস সংগ্রহ করার কাজ সহজতর হলো।

প্রিষ্টলীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটি হয় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর তিনি পারদের লাল সর (মারকিউরিক অক্সাইড) থেকে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করতে সমর্থ হন। একটি বকযন্ত্রে তিনি পারদের লাল অক্সাইড যোগ নেন। একটি অতসী কাচের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে ঐ লাল অক্সাইডের ওপর সংহত করে যৌগটিকে উত্তপ্ত করেন। তার ফলে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তা পারদ অপসারণের দ্বারা একটি বেলজারে সংগ্রহ করেন। একটি নিভন্ত কাঠি ঐ গ্যাসের সংস্পর্শে নিয়ে আসা মাত্রই তা উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে ওঠে। শুধু তাই নয়। দেখা যায় যে, ইঁদুর বা ঐ রকম ছোটখাট প্রাণী ঐ গ্যাসের ভেতরে রাখলে ওরা দিব্যি বেঁচে থাকে। প্রিষ্টলী এই গ্যাসটির নাম দিয়েছিলেন 'ডিফ্লোজিষ্টিকেটেড এয়ার'। পরে ল্যাভয়সিয়ার এরই নাম দিয়েছিলেন 'অক্সিজেন গ্যাস'।

প্রিষ্টলী ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং ফরাসী বিপ্লবের সমর্থক। এই দুই রাজনৈতিক বিশ্বাস থাকার জন্যে তিনি ইংলণ্ডবাসীদের চক্ষুশূল হয়েছিলেন। এমন কি, লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিও তাঁকে একঘরে করে দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠায় প্রিষ্টলী অবশেষে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় চলে যান। সেখানে তিনি বীরের সংবর্ধনা লাভ করেন। বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁকে ফিলাডেলফিয়ায় স্বাগত জানান। তাঁকে পেনসিলভিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ জানান বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্কলিন, কিন্তু প্রিষ্টলী তাতে রাজী হন না। তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রাখার কাজেই আত্মনিয়োগ করেন।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় বসেই তিনি শ্বেত-তপ্ত চারকোলের ওপর দিয়ে ষ্টীম পরিচালনা করে কার্বণ মনোক্সাইড গ্যাস আবিষ্কার করেন। এরপর আবিষ্কার করেন 'নাইট্রাস অক্সাইড' বা 'লাফিং গ্যাস'—যা শুঁকলে

হাসি পায়। ইংলণ্ডের এই বিজ্ঞানী আমেরিকায় এসে সেখানে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের বীজ বপন করেন। তাতে ইংলণ্ডের যতটুকু ক্ষতি হয়, ঠিক ততটুকুই লাভ হয় আমেরিকার।

প্রিষ্টলীর মৃত্যুর পর আমেরিকায় তাঁর বাসগৃহ ও গবেষণাগারটি একটি জাতীয় যাতুঘরে পরিণত হয়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তিনি যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিলেন তা স্থান পায় সেই যাতুঘরে।

—
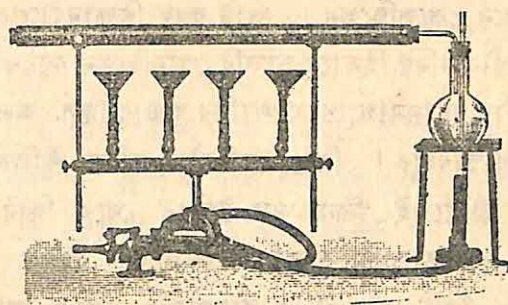
শীলি

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪২—১৭৮৬)

ইংরেজ ধর্মযাজক ও বৈজ্ঞানিক জোসেফ প্রিষ্টলী ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করে বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুইডেন দেশের বিজ্ঞানী 'কার্ল শীলি' জোসেফ প্রিষ্টলীর কয়েক বছর আগেই অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেছিলেন। অবশ্য ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে সেকথা কাউকে তিনি জানাননি, আবিষ্কারের বিবরণও প্রকাশ করেননি। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাই অক্সিজেন আবিষ্কারের গৌরব তাঁর কপালে জোটেনি। এ গৌরবের অধিকারী না হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক ও রসায়নবিদ্ ছিলেন কার্ল শীলি।

সুইডেনের 'ষ্ট্রালসাণ্ড' নামক স্থানে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে কার্ল উইলহেল্‌ম্ শীলির জন্ম হয়। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি এক ঔষধ প্রস্তুতকারক ও ঔষধ ব্যবসায়ীর দোকানে শিক্ষানবীশের কাজ শুরু করেন। এর আগে স্কুলে তিনি সামান্যই লেখাপড়া করেছিলেন। দোকানের মালিকের বাড়িতেই শীলিকে থাকতে হতো। ঘুম থেকে উঠতে হতো প্রত্যূষে। তারপর ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে আরম্ভ করে শিশি-বোতল ধোওয়া পর্যন্ত সব কাজই তাঁকে করতে হতো।

বালক শীলির পর্যবেক্ষণ-শক্তি ছিল প্রবল। আর প্রবল ছিল শিক্ষার

প্রতি আগ্রহ। ঐ বয়সেই তিনি বিভিন্ন রসায়নিক দ্রব্যের নাম ও তাদের ধর্ম জেনে ফেলেছিলেন। আট বছর শিক্ষানবীশের কাজ করার পর তিনি সহকারী কেমিষ্ট হিসাবে চাকরি পেয়েছিলেন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে।

তাঁর রসায়নাগারে যন্ত্রপাতির অভাব ছিল, অভাব ছিল আরও অনেক সুযোগ-সুবিধার। কিন্তু কেমিষ্টের কাজে শীলির দক্ষতা ছিল। তাই ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দেই 'ক্রিম অফ টার্টার' থেকে তিনি 'টারটারিক অ্যাসিড' প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। অ্যাসিডটি প্রস্তুত করেই ক্ষান্ত হলেন না শীলি। তিনি তার ধর্ম ও ব্যবহারের কথাও লিপিবদ্ধ করে রাখলেন। তা পাঠে জানা গেল যে—কাঠ সংরক্ষণে, বেকিং পাউডার ও সিড্‌লিজ পাউডার প্রস্তুতিতে এই অ্যাসিডটির ব্যবহার আছে।

এরপর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শীলি আবিষ্কার করলেন ক্লোরিন গ্যাস। কিছুকাল পরে 'ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড' নামক যৌগকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিদি 'ম্যাঙ্গানিজ' নামক ধাতব মৌলের পরিচয় পেলেন ও পরে ম্যাঙ্গানেট নামক যৌগগুলি আবিষ্কার করলেন। শুধু তাই নয়, কাচ রঞ্জনে ম্যাঙ্গানেট যৌগদের ব্যবহারেরও নির্দেশ দিলেন। এ ভিন্ন পারদ, লোহা ও তামার জারণক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করে গবেষণালব্ধ ফলগুলি তিনি লিখে রাখলেন। পরের বছর আরসেনিয়াস অ্যাসিডকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি আর্সেনাইট ও আর্সাইন নামক যৌগ দুটি আবিষ্কার করলেন।

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শীলি তাঁর রচিত একখানি বই প্রকাশ করলেন। বইখানির নাম 'কেমিকেল ট্রিটিজ অন এয়ার অ্যাণ্ড ফায়ার'। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে তিনি যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, সে-সবেরই বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল ঐ বইতে। তিনটি বিভিন্ন উপায়ে শীলি অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই সব প্রস্তুত-প্রণালীও লিপিবদ্ধ ছিল ঐ বইতে। অবশ্য শীলি তখন অক্সিজেন গ্যাসের নাম দিয়েছিলেন 'ফায়ার এয়ার'। 'অক্সিজেন' নামটা ল্যাভয়সিয়রের দেওয়া—আরও পরে।

শীলির আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো রূপার বিভিন্ন যৌগের ওপর আলোর প্রভাব নিরূপণ। তাঁর এই গবেষণালব্ধ ফল ফটোগ্রাফী শিল্পে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। দুধ টকে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শীলি দেখেন যে, 'ল্যাকটিক অ্যাসিড' উৎপন্ন হওয়ার দরুনই দুধ

টকে যায়। শীলি সাইট্রিক অ্যাসিড, অকজালিক অ্যাসিড ও বেঞ্জোয়িক অ্যাসিডের ধর্মও নিরূপণ করেন। এ ভিন্ন গ্লিসারিন, প্রুসিক অ্যাসিড এবং টাংস্টিক অ্যাসিড তিনি আবিষ্কার করেন।

আজীবন রসায়ন বিজ্ঞানের পরীক্ষা করে যাওয়াই শীলির মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর রসায়নাগারটিতে ভাল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে পরীক্ষাকালে ক্লোরিন, আর্সেনেট, প্রুসিক অ্যাসিড প্রভৃতি বহু বিষাক্ত যৌগ হতে নির্গত ধোঁয়া ক্রমাগত শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর সেই অসুস্থতাই তাঁকে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইহলোক থেকে বিদায় নিত্যে বাধ্য করে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখে তিনি চিরবিদায় নেন। আজীবন শীলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালিয়ে যান কোনো পুরস্কারের লোভে নয়—শুধু আবিষ্কারের নেশায়। তিনি নিজেই বলে গেছেন ঃ নতুন নতুন ঘটনা প্রত্যক্ষ করাতেই আমার আনন্দ। আর সেই আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যেই আমার গবেষণা।

—
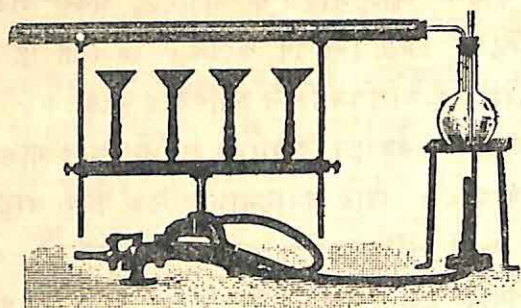
এডওয়ার্ড জেনার

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪৯—১৮২৩)

বসন্ত!

এই নামটি শুনলেই মানুষ এককালে ভয়ে আঁতকে উঠত। ভয় পাবার কথাই তো। মহামারীর আকার ধারণ করে এই মারাত্মক রোগটি কত মানুষেরই যে জীবন কেড়ে নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। টিকা আবিষ্কারের আগে এই রোগে মানুষ আকছার মরতো। যারা বাঁচতো তাদের দেহ ক্ষতের দাগে ভরে যেতো, দেহের শ্রী যেতো চলে।

যাঁর অক্লান্ত সাধনার ফলে আজ বসন্ত রোগকে সার্থকভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে, তিনি হলেন 'এডওয়ার্ড জেনার'। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তারিখে ইংলণ্ডের 'বার্কলি' নামক স্থানে এডওয়ার্ড জেনারের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন গ্রামের একজন সাধারণ ধর্মযাজক। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে জেনার পিতৃহারা হন এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা রেভারেণ্ড ষ্টিফেন জেনারের কাছে প্রতিপালিত হন। গাছপালা, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ—এসব ছেলেবেলা থেকেই জেনারকে আকৃষ্ট করতো। তিনি এদের বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করে আনন্দ পেতেন।

স্কুলের পাঠ শেষ করে জেনার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে যান। আজকাল যেমন ডাক্তারী পড়তে হলে কলেজে গিয়ে পাঁচ-ছয় বছর পড়াশুনা করতে হয়, তখনকার দিনে তেমনটি ছিল না। তখনকার দিনে

ডাক্তারী পড়তে হলে ছাত্রকে সর্বপ্রথম একজন ডাক্তার-গুরু যোগাড় করতে হতো। সেই ডাক্তার-গুরুই ছাত্রকে পড়াতেন, রোগী দেখিয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। জেনারের এইরকম শিক্ষাগুরু ছিলেন ডাক্তার 'জন হাণ্টার'—ইংলণ্ডের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

লণ্ডনে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করার পর জেনার বার্কলিতে তাঁর গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং সেইখানেই ডাক্তারী শুরু করেন। বসন্ত রোগাক্রান্ত অনেক লোক তখন জেনারের কাছে আসতো চিকিৎসার জন্য। জেনার তাদের দেখতেন আর ভাবতেন—এমন কোনো উপায় উদ্ভাবন করা যায় নাকি, যাতে করে বসন্ত রোগের আক্রমণই হবে না! জেনার ভাবতেন কিন্তু ভেবেও কূলকিনারা খুঁজে পেতেন না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে তুরস্ক ও চীনদেশের লোকেরা বসন্ত রোগ প্রতিরোধের জন্যে একরকম টিকা ব্যবহার করতো। তারা দেখেছিল যে, বসন্ত রোগাক্রান্ত লোকের বসন্তের গুটি থেকে একটুখানি পুঁজ নিয়ে তা একজন সুস্থ লোকের রক্তে ঢুকিয়ে দিলে—ভবিষ্যতে ঐ সুস্থ লোকের আর বসন্ত রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বসন্ত প্রতিরোধ করা মোটেই নিরাপদ ছিল না। কেননা, সুস্থ লোকের দেহে বসন্তের বীজ ঢোকাবার ফলে রোগের আক্রমণ সামান্য হবে কি তীব্র হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আক্রমণ সামান্য হলে ভালই, কিন্তু তীব্র হলে জীবন-মরণ সমস্যা। এই পদ্ধতিতে তখন সাফল্যের চেয়ে অসাফল্যটাই আসতো বেশী। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতিতে বসন্তের সত্যিকারের কোনো প্রতিবিধান ছিল না।

ডাক্তার জেনার এসব কথা জানতেন। জেনেশুনে তিনি এবার এগিয়ে এলেন এক দুঃসাধ্য কাজে—বসন্ত রোগ-প্রতিরোধক টিকা আবিষ্কারের কাজে।

জেনার লক্ষ্য করেছিলেন যে, মানুষের মত গরুরও বসন্ত রোগ হয়। গো-বসন্ত কিন্তু তত মারাত্মক রোগ নয়। যেসব গোয়ালিনী দুধ দোয় তাদের হাতে দু'একটি গো-বসন্তের গুটি বেরোয় এবং সেই গুটি কেবল হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে—শরীরের অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়ে না।

জেনার যখন ডাক্তারী পড়তেন তখন এক গোয়ালিনী তাঁকে বলেছিল : আমার একবার গো-বসন্ত হয়ে গেছে, কাজেই বসন্ত রোগ হবার আর ভয়

নেই। গোয়ালিনীর সেই উক্তি মনে ছিল জেনারের। চিকিৎসক হবার পর তিনি ভাবতে লাগলেন—গোয়ালিনীর ঐ উক্তির মধ্যে কি কোনো সত্য আছে? যদি থাকে, তবে তা খুঁজে বার করতে হবে।

সে সুযোগ মিলে গেল অল্পদিনের মধ্যেই—১৭৯৬ সালের ১৪ই মে তারিখে। ঐ দিন 'সারা নেল্‌মিস' নামে এক গোয়ালিনী চিকিৎসার জন্য এল জেনারের কাছে। তার হাতে গো-বসন্তের কয়েকটা গুটি দেখতে পেলেন জেনার। তিনি তক্ষুনি গোয়ালিনীর গায়ের ঐ গুটি থেকে কিছু পুঁজ সংগ্রহ করলেন এবং গ্রামে গিয়ে 'জেমস ফিপ্‌স' নামে একটি আট বছরের ছেলেকে টিকা দিলেন তাই দিয়ে।

'জেমস ফিপ্‌স' আগে কখনো বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়নি। টিকা নেওয়ার পর ফিপ্‌সের ক্ষতস্থানে গো-বসন্তের মত ঘা সৃষ্টি হলো। কিছুদিন পরে সেই ঘা গেল শুকিয়ে এবং সেখানে একটা দাগ থেকে গেল। এরপর জেনার ঐ ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে অনেক বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করতে গেলেন। ফিপ্‌সের কিন্তু বসন্ত রোগ হলো না। এরপর জেনার বসন্ত রোগীর শরীরের ক্ষত থেকে পুঁজ সংগ্রহ করে এনে ফিপ্‌সের দেহে ক্ষত সৃষ্টি করে তাতে লাগিয়ে দিলেন। তাতেও ফিপ্‌স বসন্ত রোগাক্রান্ত হলো না। জেনার বুঝলেন, টিকা নেওয়ার ফলে ফিপ্‌সের শরীরে নিশ্চয়ই বসন্ত রোগ-প্রতিরোধক শক্তি জন্মেছে। ফিপ্‌সের পর আরও তেইশজন রোগীকে অনুরূপ টিকা দিয়ে সুফল পেয়ে জেনার তাঁর অনুমান সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, গো-বসন্তের টিকা নিলে বসন্ত রোগ আর হয় না।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনার তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। জেনারের এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশে চাঞ্চল্য দেখা গেল। তাঁর আবিষ্কারের কথা কেউ বিশ্বাস করলো, আবার কেউ বা করলো না। অনেকে জেনারকে জানালেন অভিনন্দন তাঁর এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য এবং টিকা সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য জানতে চাইলেন। আবার কেউ কেউ-বা নানাভাবে তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে লাগলেন। ব্যঙ্গ চিত্র বেরুলো—গোরুর পুঁজ নিয়ে টিকা দেওয়ায় মানুষের মুখ গোরুর মত হয়েছে, মাথায় শিং গজিয়েছে। আরও কত কি! জেনার কিন্তু এইসব বিরূপ

সমালোচনায় আদৌ নিরুৎসাহিত হলেন না। ধৈর্য ধরে বছরের পর বছর তিনি মানুষের ওপর টিকার কার্যকারিতা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ইংলণ্ডে ১৮ মাসের এক পরীক্ষার সমীক্ষায় দেখা গেল যে, সেখানে টিকা দেওয়ার পর বসন্ত রোগে মৃত্যুর হার বছরে ২০১৮ থেকে নেমে ৬২২-এ দাঁড়িয়েছে।

ধীরে ধীরে জেনারের আবিষ্কার সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করতে লাগলো। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের জেনারের কাছে আনতে লাগলেন টিকা দেওয়ার জন্য। সম্রাট নেপোলিয়ান টিকা নিলেন। টিকা নিলেন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট জেফারসন। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী জেনারকে হীরার আংটি উপহার পাঠালেন। জার্মানী জেনারকে সম্মানিত করলো—প্রথম টিকা দেবার তারিখটিকে জাতীয় উৎসবের দিন হিসাবে পালন করে। মোরাভিয়ার ব্রুণে একটি মন্দির জেনারের নামে উৎসর্গ করা হলো এবং সেখানে স্থাপন করা হলো 'রয়্যাল জেনারিয়ান সোসাইটি'।

নেপোলিয়ান জেনারকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধরত, তখন একবার দু'জন ইংরাজ যুদ্ধবন্দীকে দেশে ফিরিয়ে দেবার জন্য জেনার নেপোলিয়ানকে অনুরোধ জানান। নেপোলিয়ান তখন বলেছিলেন: টিকার আবিষ্কর্তাকে আমার অদেয় কিছু নেই।—এই বলে ঐ যুদ্ধবন্দী দু'জনকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন।

বিদেশে জেনার প্রভূত সম্মান পেলেও নিজের দেশে তিনি সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি। ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি তাঁর গবেষণাপত্রকে মনোনীত করেননি। রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস্ জেনারকে তাঁদের সমিতির সদস্যভুক্ত করতে অস্বীকার করেছিলেন এই অজুহাতে যে, জেনার ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা জানেন না। তাঁরা বলেছিলেন যে, ঐ সমিতির সদস্য হতে হলে জেনারকে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। জেনার পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে তিনি ঐ সমিতির সদস্যও হতে পারেননি। পরবর্তীকালে অবশ্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট গবেষণা চালাবার জন্য জেনারকে ৩০ হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করেছিলেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করেছিলেন।

টিকার আবিষ্কর্তা জেনার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আজ জেনার ইহলোকে নেই, কিন্তু তাঁর আবিষ্কার রয়ে গেছে মানুষের কাছে বিজ্ঞানের আশীর্বাদরূপে। মানুষ তাই কোনোদিন জেনারকে ভুলবে না—সশ্রদ্ধচিত্তে চিরকাল তাঁকে স্মরণ করবে।

—

জন ডালটন

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬৬—১৮৪৪)

ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের রাজসভা সেদিন আলোয় ঝলমল করছে। সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত বহু দর্শক-সমাগম হয়েছে সেদিন রাজসভায়। কারণ কি ?—কারণ রাজা সেদিন তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট প্রজাকে সম্মানিত করবেন।

রাজ-দরবারে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হতে হলে বিশেষ ধরনের পোশাক পরে আসতে হয়। সম্মানিত প্রজাবৃন্দ সেই পোশাকেই এসেছেন। কিন্তু একজন এসেছেন সাধারণ পোশাকে। তিনি আর কেউ নন—বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী 'জন ডালটন'।

সমবেত জ্ঞানী-গুণী প্রজাদের সবাইকেই রাজার সম্মুখে আনা হয়েছে। রাজা তাঁদের সম্মানিত করছেন। কিন্তু বাকি শুধু একজন।

তিনি আর কেউ নন—জন ডালটন। তাঁর জন্যে পড়ে রয়েছে ভেলভেটের কুর্তা, চকচকে ঝকঝকে জুতো আর তরোয়াল। এইসব পরে তাঁকে হাজির হতে হবে রাজার সম্মুখে! কিন্তু ডালটন নারাজ। তিনি

'কোয়েকার' ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক। ওরকম পোশাক পরা তাঁর ধর্মে নিষিদ্ধ।

এদিকে রাজা সিংহাসনে বসে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন বিজ্ঞানী ডালটনের জন্য। প্রধানমন্ত্রী লর্ড চেম্বারলেন জেদী ডালটনের একগুঁয়েমিতে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। দর্শকরাও অধৈর্য হয়ে উঠেছেন।

এই অচল অবস্থার অবসানের জন্য দর্শকদের মধ্য থেকে এক সুদর্শন যুবক এগিয়ে এলেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের পোশাক পরে ডালটনকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হতে রাজী করালেন। তখন ডালটনকে সমাবর্তনের লাল পোশাক পরিয়ে দেওয়া হলো। সেই পোশাকেই তিনি রাজার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁকে সম্মানিত করলেন। কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোকদের কিন্তু ঐ রকম লাল পোশাক পরাও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ডালটন বর্ণান্ধ ছিলেন বলে ঐ পোশাকের আসল রঙটা তিনি বুঝতে পারেননি।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের একটি ছোট গ্রামে তাঁতীর ঘরে জন ডালটনের জন্ম হয়। সে গ্রামের নাম 'ঈগল্‌স্‌ফিল্ড'। তাঁর পিতার নাম 'জোসেফ' ও মাতার নাম 'ডেবরা'। ছেলেবেলা থেকেই ডালটন ছিলেন মেধাবী ও দারুণ পরিশ্রমী। গ্রামের স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি লেখাপড়া শেষ করেছিলেন। অঙ্কে ছিল তাঁর অসাধারণ দখল। আর দখল ছিল গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার ওপর। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই গ্রামের লোকেরা তাঁকে প্রতিভাসম্পন্ন বালক বলে মেনে নিল। ঐ বয়সেই ডালটন একটি স্কুল খুলে বসলেন। সে স্কুল ভাল চললো না।

ডালটনের ছিল একটা মজাদার নেশা। খারাপ নেশা নয়। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং তার খুঁটিনাটি ফলাফল খাতার পাতায় লিখে রাখাই ছিল তাঁর নেশা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ কাজ তিনি করে গেছেন। নিজের তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়ে তিনি কাজ চালাতেন। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা মাপতেন, চাপ মাপতেন আর মাপতেন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন : আবহাওয়ার এসব তথ্য জানাতে পারলে চাষীদের সুবিধা হবে, নাবিকদের সুবিধা হবে, উপকার হবে সমগ্র মানব-সমাজের।

১৭৮৭ সালে ডালটনের খেয়াল হলো যে, তিনি জনসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াবেন। শুরু করলেন বক্তৃতা দেওয়া। কিন্তু

মোটেই কৃতকার্য হলেন না। অকৃতকার্য হয়ে তিনি এরপর ফুল আর প্রজাপতি সংগ্রহে মন দিলেন। এসব জিনিস সংগ্রহ করে বইয়ের পাতার মধ্যে রেখে সেগুলি পরে তিনি দর্শকদের দেখাতেন। এদের বৈচিত্র্য দর্শকদের বুঝিয়ে দিতেন। এ কাজেও তিনি বিফল হলেন। বিফল হয়ে তিনি ভিন্ন পথ নিলেন। লিখলেন একটি গ্রামার বই। বিজ্ঞানীর লেখা গ্রামার বই পণ্ডিতেরা পছন্দ করলেন না।

প্রতিভা কখনও বিফলে যায় না। ডালটনের ক্ষেত্রেও তাই হলো। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ পেয়ে গেলেন। জীবনে কৃতকার্যতার পথে সেই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। এই সময়েই তিনি বর্ণান্ধতা সম্পর্কে তাঁর গবেষণা-পত্রটি প্রকাশ করলেন। আর তখন থেকেই বর্ণান্ধতা 'ডালটনিজম' নামেও পরিচিত হলো।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর ডালটন কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গ্যাসের আংশিক চাপের সূত্র আবিষ্কার করলেন। সেই সূত্রানুযায়ী কতকগুলি গ্যাস মিশ্রণের সামগ্রিক চাপ, মিশ্রণের অন্তর্গত প্রতিটি গ্যাসের পৃথক পৃথক চাপের সমষ্টি মাত্র। এরই নাম 'ডালটনের আংশিক চাপের সূত্র'।

ডালটনের জীবনের সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো 'পরমাণুবাদ' আবিষ্কার। সুদীর্ঘ গবেষণার পর ডালটন তাঁর পরমাণুবাদ প্রচার করেন। পরমাণু-বাদের মূল বক্তব্য হলো চারটি। (১) প্রতিটি পদার্থ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমবায়ে গড়া। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার নাম 'পরমাণু'। (২) ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণু, ওজন ও ধর্মে বিভিন্ন কিন্তু একই মৌলের পরমাণুগুলি ওজন ও ধর্মে একই প্রকার। (৩) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই পরমাণুরাই অংশ গ্রহণ করে। বিক্রিয়ার সময় পরমাণুরা পুনর্বিন্যস্ত হয়, কিন্তু পরিবর্তিত হয় না। (৪) পরমাণু সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংস করাও যায় না।

পরমাণুবাদ আবিষ্কার করা ছাড়াও ডালটন আর একটি বড় কাজ করেছিলেন। সেটি হচ্ছে—বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মোটামুটি সঠিক পারমাণবিক ওজনের তালিকা প্রণয়ন। তিনিই প্রথম স্থির করেছিলেন যে, হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন হচ্ছে 'এক'।

চাপ প্রয়োগে বায়ুর সঙ্কোচন হয় এবং তার ফলে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি

পায়। বায়ুর সেই উষ্ণতা বৃদ্ধি ডালটনই প্রথম মাপতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ডালটনই প্রথম বলেছিলেন যে, উচ্চচাপে ও কম উষ্ণতায় সব গ্যাসকেই তরলে পরিণত করা যায়।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য ডালটন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সম্মানিত হন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞান আকাডেমির সদস্য মনোনীত হন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির পদক লাভ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি, সি, এল, ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেন।

ইংলণ্ডের এই কৃতী সন্তান পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী মহল চার হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলে সেই অর্থের সুদ থেকে ডালটনের নামে একটি বৈজ্ঞানিক মেধাবৃত্তি দানের ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য—ডালটনের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখা। কিন্তু ডালটন তাঁর কীর্তির মধ্য দিয়ে, প্রধানতঃ পরমাণুবাদের প্রবক্তা হিসাবে আজও অমর হয়ে আছেন। অমর হয়ে থাকবেনও চিরকাল।

—

আঁদ্রে ম্যারী অ্যামপিয়ার

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭৫—১৮৩৬)

ফরাসী দেশে লিয়ন্‌স্ নামে একটি শহর আছে। শহরটি ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র। আজ থেকে অনেক অনেকদিন আগে ঐ শহরে একজন দড়ি-ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে ঐ দড়ি-ব্যবসায়ীর একটি পুত্রসন্তান জন্মে। পুত্রের নাম রাখা হয় 'আঁদ্রে ম্যারী অ্যামপিয়ার'।

ছেলেবেলায় আঁদ্রের বাবা তাঁর ছেলেকে ল্যাটিন ও গ্রীকভাষা শেখাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ভাষার চেয়ে গণিতের প্রতিই বেশী আগ্রহ ছিল আঁদ্রের। বালক আঁদ্রে নুড়ি পাথর নিয়ে আপন মনে অঙ্কের সমাধান করতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর আর মেধা ছিল ক্ষুরধার। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি ক্যালকুলাস নামক উচ্চতর গণিত আয়ত্ত করে ফেলেন।

আঁদ্রের বয়স যখন আঠারো বছর তখন শুরু হয় 'ফরাসী-বিপ্লব'।

বিপ্লবীরা আঁদ্রের বাবাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে গিলোটিনে চাপিয়ে হত্যা করে। এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড তরুণ আঁদ্রের মনে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শোকে উন্মাদের মত হয়ে পড়েন তিনি।

বিপ্লবীরা আঁদ্রের বাবাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর টাকাকড়ি, জমিজমা, এমনকি বাড়িটি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে। ফলে আঁদ্রেকে হতে হয় পথের ভিখারী। কিন্তু তিনি বাড়ির বড় ছেলে। কাজেই সংসার চালানোর দায়িত্ব তাঁর উপরেই পড়ে। যেটুকু লেখাপড়া জানা ছিল, তার ওপর নির্ভর করে তিনি গৃহশিক্ষকতা শুরু করেন। সেই সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশুনাও চালাতে থাকেন।

এই সময় পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও গণিতের উপর তিনি কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ মৌলিক প্রবন্ধ লেখেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হয় এবং বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়। স্থানীয় এক মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে ডেকে পাঠান স্কুলে শিক্ষকতা করবার আহ্বান জানিয়ে, সে আহ্বানে সাড়া দেন আঁদ্রে। বছর পাঁচেক ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করার পর বোর্গ-এর এক কলেজে তিনি অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। আরও পরে ১৮০৪ সালে তিনি প্যারিসের 'ইকোল-পলিটেক্‌নিক' নামক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে গণিত ও বলবিদ্যা অধ্যাপনা শুরু করেন এবং তাঁর অবশিষ্ট কর্মজীবন ঐখানেই অতিবাহিত হয়।

কলেজে ছাত্রদের পড়িয়েই ক্ষান্ত থাকতেন না অ্যামপিয়ার। সেই সঙ্গে চালাতেন নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পদার্থবিদ্যায় মৌলিক গবেষণা করে তিনি সর্বপ্রথম তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। তিনি বিজ্ঞানের ঐ নতুন শাখার নাম দেন 'ইলেকট্রো-ডায়নামিক্স'।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এইদিন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওরষ্টেড চুম্বকের উপর তড়িৎপ্রবাহের ফল সম্পর্কে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। পরীক্ষার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে, কোনো পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলে ঐ তারের নীচে রাখা চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ ঘটে। বিক্ষিপ্ত শলাকাটি তখন তারের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে। কিন্তু তারটি শলাকার তলা দিয়ে গেলে অথবা তারের মধ্য দিয়ে

তড়িৎ বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হলে শলাকাটির বিক্ষেপ হয় উল্টো দিকে।

ওরষ্টেডের এই আবিষ্কার তড়িৎ বিজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা করলো। ওরষ্টেডের এই আবিষ্কারের বিষয় ঘোষিত হওয়ার মাত্র এক সপ্তাহ পরে ১৮২০ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্যারিসের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে আঁদ্রে অ্যামপিয়ার তাঁর নবলব্ধ গবেষণার কথা শোনালেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, চৌম্বকত্ব সৃষ্টির জন্য যে সবসময় চুম্বকের প্রয়োজন হয় তা নয়। তড়িৎ প্রবাহের সাহায্যেও চৌম্বকত্ব সৃষ্টি করা যায়। চুম্বকের চারদিকে যেমন চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, তেমনি তড়িৎ প্রবাহের চারদিকেও একটা নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে সৃষ্টি হয় চৌম্বক-ক্ষেত্র।

পরীক্ষার দ্বারা অ্যামপিয়ার প্রমাণ করলেন যে, কোনো ঋজু তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ চালনা করলে ঐ তারের চতুর্দিকে কতকগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকার চৌম্বক বলরেখা সৃষ্টি হয়। আর ঐ বৃত্তগুলির তল, তারের তড়িতের অভিমুখের সমকোণে থাকে। আবার ঐ ঋজু তারের মধ্য দিয়ে উল্টো দিকে তড়িৎ পরিচালনা করলে বলরেখার অভিমুখও উল্টো হয়। এ ভিন্ন অ্যামপিয়ার প্রমাণ করলেন যে, দু'টি তড়িৎবাহী তার সমান্তরালভাবে কাছাকাছি রাখলে, প্রবাহের অভিমুখ অনুযায়ী ওদের ভেতর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। উভয় তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ একই দিকে প্রবাহিত হলে উভয় তারের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে উভয় তারের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ পরস্পরের বিপরীত হলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ দেখা যায়। শুধু তাই নয়—প্রবাহমাত্রা, দু'টি পরিবাহী তারের মধ্যেকার দূরত্ব এবং আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের প্রাবল্যের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তা তিনি গাণিতিক সূত্রাকারে প্রকাশ করলেন। সূত্রটি অভ্রান্ত বলেই সেই ১৮২০ সাল থেকে আজ অবধি তা চলে আসছে।

এরপর অ্যামপিয়ার সলিনয়েডে তড়িৎ প্রবাহের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করলেন। এক্ষেত্রে 'সলিনয়েড' কাকে বলে তা জানা দরকার। একটি দীর্ঘ অন্তরিত তারকে একটি অন্তরক চোঙের গায়ে যদি এমনভাবে জড়ানো যায় যে প্রতি পাক চোঙের অক্ষের সঙ্গে অভিলম্ব হয়, তবে ঐ কুণ্ডলীকে 'সলিনয়েড' বলে। অ্যামপিয়ার প্রমাণ করলেন যে, তড়িৎ প্রবাহযুক্ত সলিনয়েড, 'দণ্ডচুম্বকের' মত ধর্মযুক্ত হয়। সলিনয়েডে তারের পাক সংখ্যা

বাড়ালে সলিনয়েডের চৌম্বক শক্তিও সরাসরি বাড়ে। সলিনয়েডের কোন্ মুখে কোন্ মেরুর উৎপত্তি হবে তাও নির্দেশ করে গেলেন অ্যামপিয়ার।

তড়িৎপ্রবাহের আণবিক তত্ত্ব আবিষ্কার—অ্যামপিয়ারের আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান। স্থায়ী চুম্বকের চৌম্বকত্বের মূলে আছে আণবিক তড়িৎ—এটা অ্যামপিয়ারই প্রথম প্রমাণ করেন।

বিজ্ঞানী অ্যামপিয়ারের নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তড়িৎ-প্রবাহের ব্যবহারিক এককের নাম রাখা হয়েছে 'অ্যামপিয়ার'। তাছাড়া 'অ্যাম্‌মিটার' নামক বৈদ্যুতিক যন্ত্রটির নামের সঙ্গেও বিজ্ঞানী অ্যামপিয়ারের নাম জড়িত আছে। আসলে যন্ত্রটির নাম 'অ্যামপিয়ার মিটার'। সংক্ষেপে 'অ্যাম্‌মিটার'।

বিজ্ঞানী অ্যামপিয়ারের আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, বৈদ্যুতিক মোটর, জেনারেটার, রেডিও ও টেলিভিশন। কাজেই তড়িৎ-বিজ্ঞানে অ্যামপিয়ারের অবদান যে খুব বেশী তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

—

জোন্‌স জ্যাকব বার্জেলিয়াস

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭৯—১৮৪৮)

জোন্‌স জ্যাকব বার্জেলিয়াসের জন্ম সুইডেন দেশের 'ভেফারসুণ্ডা' নামক স্থানে। জন্মকাল ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট। শৈশবে বার্জেলিয়াস তাঁর পিতা-মাতাকে হারিয়েছিলেন। অনাথ বালকের পক্ষে লেখাপড়া চালানো দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। সাহায্য করবার কেউ ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি ছাত্র পড়াতেন। পড়িয়ে যে অর্থ পেতেন, তাই দিয়ে নিজের পড়াশুনার খরচ চালাতেন।

স্কুল ছেড়ে বার্জেলিয়াস যান উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। সেখানে তিনি ভোল্টীয় তড়িতের বিষয় পড়েন এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থের উপর তড়িতের প্রভাব সম্পর্কে পরীক্ষা চালান। তড়িৎ শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন যৌগ থেকে মৌল পৃথক করার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি যে ইঙ্গিত দেন, তা ইংলণ্ডের কৃতী বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রী ডেভির গবেষণার পথকে প্রশস্ত করে দেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের কথা।

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের প্রতীকচিহ্ন তখনও ঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। কিছু কিছু গ্রীক ও মিশরীয় প্রতীক চিহ্ন তখন প্রচলিত ছিল। আবার অ্যালকেমিষ্টরা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থকে বোঝাতে রহস্যময় নানারকম আঁকজোক ব্যবহার করতেন। তখনকার দিনের একটি বইতে একমাত্র পারদকে বোঝাতেই ৩৫টি বিভিন্ন নাম এবং ২০টি বিভিন্ন প্রতীকচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছিল। পারদের কোন্ নামটি বা প্রতীকচিহ্নটি গ্রহণ করা হবে—তা স্থির করা ছিল এক মহা সমস্যা। বিজ্ঞানসম্মত কোন ভাষা না থাকায় রসায়নের উন্নতির পথ তখন ছিল বন্ধ।

ভাষার জটিলতা থেকে মুক্ত করে রসায়নকে গতিশীল বিজ্ঞানরূপে গড়ে তোলার কাজে সেই সময় এগিয়ে এলেন বার্জেলিয়াস। অনেক চিন্তা করে তিনি রসায়নের যে সাংকেতিক ভাষা প্রবর্তন করলেন, তা সহজবোধ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য হলো। তিনি বললেন, প্রতিটি মৌলের নামের বড় হরফের আদ্যাক্ষরটিই হবে তার প্রতীকচিহ্ন। যেমন—কার্বন বোঝাতে আমরা ব্যবহার করব C প্রতীকচিহ্নটি। কিন্তু ক্যালসিয়ামের আদ্যাক্ষরও তো C, সেক্ষেত্রে? বার্জেলিয়াস বললেন, সেক্ষেত্রে প্রথম আদ্যাক্ষরের সঙ্গে তার পরবর্তী কোনো একটি ছোট হরফের অক্ষর যুক্ত হবে। সেক্ষেত্রে ক্যালসিয়ামের প্রতীকচিহ্ন হবে Ca, কোবাল্টের প্রতীক-চিহ্ন হবে Co, আর ক্যাডমিয়ামের হবে Cd। এ ছাড়াও বার্জেলিয়াস প্রস্তাব করলেন যে, সর্বত্র ল্যাটিন নাম ব্যবহার করতে হবে। যেমন—সিলভারের ল্যাটিন নাম Argentum, অতএব তার প্রতীকচিহ্ন হবে Ag, লেডের ল্যাটিম নাম Plumbum, অতএব তার প্রতীকচিহ্ন হবে Pb, অনুরূপভাবে আয়রনের (ল্যাটিন নাম Ferrum) প্রতীকচিহ্ন হবে Fe।

শুধু মৌলের প্রতীকচিহ্ন ঠিক করে দিয়েই ক্ষান্ত রইলেন না বার্জেলিয়াস। তিনি যৌগের সংকেত গঠন পদ্ধতিরও নির্দেশ দিলেন। বললেন, যৌগের অন্তর্গত মৌলগুলির প্রতীকচিহ্ন পর পর সাজিয়ে গড়তে হবে যৌগের সংকেত। যেমন—জলের সংকেত হবে HOH (অধুনা H_2O), কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংকেত হবে OCO (অধুনা CO_2)।

এতদিন পর্যন্ত নানারকম আঁকজোক ও চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন মৌলকে বোঝানো হতো। এখন থেকে প্রতিটি মৌলের জন্য সৃষ্টি হলো এক

বিজ্ঞানসম্মত সাংকেতিক ভাষা।

নতুনকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে চায় না। তাই বার্জেলিয়াস প্রবর্তিত রসায়নের ভাষাকেও সেযুগের রসায়নবিদরা সহজে মেনে নিতে পারেননি। শেষে অবশ্য জয় হয়েছিল বার্জেলিয়াসেরই। তাঁর প্রবর্তিত রসায়নের ভাষাই স্বীকৃত হয়েছে।

উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সময় থেকেই বিশ্লেষণাত্মক রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বার্জেলিয়াস। একজন অধ্যাপককে অনুরোধ করে রসায়নাগারে বেশীক্ষণ ধরে কাজ করার অনুমতিও তিনি যোগাড় করেছিলেন। কাজের নেশা তাঁকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে, অনেক সময় তিনি ক্লাশ কামাই করে রাসায়নিক পরীক্ষায় মগ্ন থাকতেন।

স্নাতক হবার পর জীবিকার্জনের প্রয়োজন দেখা দিল বার্জেলিয়াসের। প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করে মনের মতন একটি গবেষণাগার গড়ে তুলতেই হবে— এই ছিল বার্জেলিয়াসের সংকল্প ও স্বপ্ন। এ স্বপ্ন সফল করার জন্য জীবনের পরবর্তী কুড়িটি বছর তিনি অনেক রকম কাজ করেছেন। কখনো বোতলে খনিজ জল ভরে বিক্রি করেছেন। কখনো ভিনিগারের কারখানা খুলে বসেছেন। আবার কখনো বা বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর এই সব প্রচেষ্টা হয়েছে ব্যর্থ। বড়লোক তিনি কখনো হতে পারেননি।

মানুষের জীবন সব সময় একভাবে চলে না। আঁধার রাত্রি কেটে গিয়ে যেমন নতুন প্রভাত আসে, তেমনি বার্জেলিয়াসের জীবনের দুঃখময় দিনগুলিও একদিন গেল কেটে। তিনি ষ্টকহল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন-বিদ্যার অধ্যাপকের পদ লাভ করলেন। পেলেন সুসজ্জিত গবেষণাগার এবং গবেষণা চালাবার জন্য প্রচুর অর্থ। সেইদিন থেকে বার্জেলিয়াসের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। তিনি বহু দেশে আমন্ত্রিত হলেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। সুযোগ পেলেন নিজের গবেষণার কথা দেশ-বিদেশে প্রচার করার, আর সুযোগ পেলেন বিশ্বের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মেলামেশার।

এই সময় থোরিয়াম, সিরিয়াম ও সেলিনিয়াম নামক তিনটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করে বার্জেলিয়াস জগৎজোড়া খ্যাতি পেলেন। অনিয়তাকার সিলিকন প্রথম প্রস্তুত করেও তিনি প্রভূত যশ লাভ করলেন।

কিন্তু ঐ সময় ঘটে গেল এক আকস্মিক দুর্ঘটনা। গবেষণাগারে এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তিনি প্রায় অন্ধ হয়ে গেলেন। বেশ কিছুকাল পড়ে রইলেন হাসপাতালে।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী 'জন ডালটন' বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজনের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। বার্জেলিয়াস দেখলেন যে, ঐ তালিকার অন্তর্গত পারমাণবিক ওজনগুলি নির্ভুল নয়। নির্ভুলভাবে পারমাণবিক ওজন নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বার্জেলিয়াস তখন থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। অবশেষে তাঁর গবেষণার ফলাফল—পারমাণবিক ওজনের একটি নতুন তালিকা তিনি প্রকাশ করলেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমানকালে বিভিন্ন মৌলের যে সব পারমাণবিক ওজন প্রচলিত আছে তার থেকে বার্জেলিয়াসের তালিকার পারমাণবিক ওজন-গুলির পার্থক্য খুবই কম। বার্জেলিয়াসের গবেষণাগার ছিল সেকেলে ধরনের—যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যও ছিল অপ্রতুল। তবুও অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের ফলে বার্জেলিয়াস তাঁর এই গবেষণায় অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন।

এরপর বার্জেলিয়াস সুইডিস অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের কর্মসচিব পদে নিযুক্ত হলেন। জীবনে যশের সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছল্যও এল। কিন্তু তখন বয়স হয়ে গেছে অনেক, স্বাস্থ্য ভাল নয়—তার ওপর নিঃসঙ্গ জীবনও ভাল লাগছিল না বার্জেলিয়াসের। তাই ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি বিয়ে করলেন।

এরপর তাঁর জীবনের অবশিষ্ট বারোটি বছর বেশ ভালই কাটলো। বহু সম্মান তিনি লাভ করলেন। ছাত্ররূপে পেলেন সুইডেনের রাজাকে। রাজা চতুর্দশ চার্লস তাঁকে 'ব্যারন' উপাধিতে ভূষিত করলেন, রাশিয়ার 'জার' এলেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে; অর্থ ও যশ—কোনটিরই অভাব রইল না তাঁর জীবনে। কিন্তু জীবনে সবচেয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করলেন বার্জেলিয়াস সেইদিন—যেদিন তাঁর স্বপ্ন হলো সার্থক—নিজের বাসভবনটিকে যেদিন তিনি একটি গবেষণাগারে পরিণত করতে পারলেন।

—
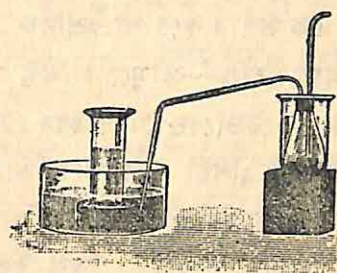
স্যামুয়েল মোর্স

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৯১—১৮৭২)

টরে টক্কা, টরে টক্কা, টক্কা-টক্কা-টরে-টরে।
হ্যাঁ, এটাও একটা ভাষা—তবে সাংকেতিক ভাষা।
এ ভাষায় বার্তা বিনিময় হয় টেলিগ্রাফ যন্ত্রের মাধ্যমে।
টেলিগ্রাফের চাবি টিপে সারা পৃথিবীতে অহরহ এই
সাংকেতিক ভাষায় বার্তা বিনিময় চলছে। আর এই
বার্তা বিনিময়ের যন্ত্র আমাদের নিয়ত স্মরণ করিয়ে
দিচ্ছে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের আবিষ্কর্তা স্যামুয়েল মোর্সকে।

পুরো নাম 'স্যামুয়েল ফিন্‌লে ব্রীজ মোর্স'—সংক্ষেপে স্যামুয়েল এফ, বি, মোর্স। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চার্লসটাউনে ১৭৯১ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে মোর্সের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই মোর্স ছবি আঁকতে খুব ভালবাসতেন। স্যামুয়েলের বাবা রেভারেণ্ড জেডিডিয়া মোর্স ছেলের ছবি আঁকার এই বাতিকটা মোটেই পছন্দ করতেন না।

তখনকার দিনে ছবি এঁকে জীবিকার্জন করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। তাই রেভারেণ্ড মোর্স ছেলেকে ছবি আঁকায় উৎসাহ দিলেন না। তিনি ছেলেকে 'ইয়েল'-এ পাঠালেন লেখাপড়া শিখতে। ভাবলেন—জায়গা বদল হলে ছেলের ছবি আঁকার বাতিকটা হয়তো কমতে পারে। কিন্তু তা হলো না। সেখানে গিয়ে লেখাপড়ায় তেমন মন বসাতে পারলেন না স্যামুয়েল।

ছবি আঁকতে লাগলেন পুরোদমে। উৎসাহ পেতে লাগলেন সহপাঠীদের কাছ থেকে। তারা স্যামুয়েলকে দিয়ে নিজেদের ছবি আঁকাত আর ছবি পিছু এক ডলার করে পারিশ্রমিক দিত।

যাই হোক—স্যামুয়েল কিন্তু 'ইয়েল' থেকে স্নাতক হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। রেভারেণ্ড মোর্স তখন ছেলেকে চিত্রাঙ্কন শেখার অনুমতি দিলেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ওয়াশিংটন অ্যাল্‌ষ্টনের কাছে স্যামুয়েল তখন চিত্রাঙ্কন শিখতে লাগলেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ করে স্যামুয়েল শিল্পী হিসাবে জীবিকার্জনের চেষ্টায় লণ্ডনে গেলেন। কিন্তু সেখানে ছবি এঁকে পসার জমাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন আমেরিকায়। তখন তিনি বিয়ে করেছেন। সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে মোর্স তাই ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকার অর্ডার জোগাড় করতেন। আর এক একটা ছবির জন্য পনের ডলার পর্যন্ত পারিশ্রমিক পেতেন।

ক্রমে মোর্সের তিনটি সন্তান হলো। সংসারের খরচ আগের থেকে অনেক বাড়ল। কিন্তু সেই অনুপাতে রোজগার বাড়ল না। এদিকে একে একে দুটি সন্তান মারা গেল। যক্ষ্মা রোগে ভুগে স্ত্রীও মারা গেলেন। নিদারুণ শোকে মোর্স মুষড়ে পড়লেন। ছবি আঁকায় মগ্ন থেকে শোক ভুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে ভাগ্যান্বেষণে মোর্স চলে গেলেন ইউরোপে।

প্রধানতঃ শিল্পী হলেও বিজ্ঞানের নানান বিষয়ে খোঁজখবর রাখতেন মোর্স। বিশেষ করে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন কৌতূহলী। শিল্পচর্চার মাঝেও বিজ্ঞানচর্চা করতেন একটু-আধটু। ফরাসী সংবাদ-প্রেরণ পদ্ধতি বা 'সীমাফোর' এই সময় মোর্সকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যাপারে বিদ্যুৎকে কাজে লাগাবার সংকল্প করেন। এই সংকল্প নিয়ে তিনি ফিরে আসেন স্বদেশে। স্বদেশে ফিরে এসে শিল্পী মোর্স এবারে নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তড়িৎ-চুম্বক নিয়ে গবেষণা করতে করতে তিনি বিভোর হয়ে যান। ভুলে যান চিত্রাঙ্কনের কথা।

নিউইয়র্ক শহরে তখন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। মোর্স চিত্রশিল্প অধ্যাপনার কাজ পেয়েছেন সেখানে। মাস গেলে যে বেতন পান তাই দিয়ে তিনি কিনে আনেন নানান যন্ত্রপাতি। বিশ্ববিদ্যালয়েরই একটি ঘরে সেইসব যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বিদ্যুতের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের

রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হন।

অনেক বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে এনে মোর্স তাঁর গবেষণার ফলাফল দেখাতেন। কেউ উৎসাহ দিতেন, আবার কেউ বা পাগল বলে তাঁকে ঠাট্টা করতেন। মোর্স কিন্তু সেইসব সমালোচনায় কান না দিয়ে অসীম উৎসাহে কাজ করে যেতেন।

যাঁর প্রতিভা থাকে তাঁর সাধনা কখনও বিফলে যায় না। মোর্সও তাই অবশেষে প্রত্যাশিত ফল পেলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করলেন 'টেলিগ্রাফ যন্ত্র'। টেলিগ্রাফ যন্ত্রের দুটি অংশ—প্রেরক ও গ্রাহক। প্রেরক যন্ত্রের চাবি টিপে সংকেতধ্বনি করলে তা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে এবং যান্ত্রিক লেখনীর সাহায্যে কাগজের ফিতার উপর ডট এবং ড্যাশ (.—) চিহ্ন এঁকে যায়। এই ডট আর ড্যাশই হলো টেলিগ্রাফের সাংকেতিক চিহ্ন। একে বলা হয় 'মোর্স-কোড' অর্থাৎ মোর্সের সংকেত। এই চিহ্নগুলিকে নানাভাবে সাজালে যে অর্থ হয় তা অক্ষরে লিখে ভাষায় রূপান্তরিত করে নিলেই বার্তা প্রেরণ সম্পূর্ণ হয়।

১৮৪০ সালে মোর্স তাঁর টেলিগ্রাফ যন্ত্রের পেটেন্ট গ্রহণ করেন এবং সেই যন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে বিক্রী করার প্রস্তাব দেন। ১৮৪৩ সালের ৩রা মার্চ যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁর টেলিগ্রাফ যন্ত্র কিনে নেন এবং ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত টেলিগ্রাফের লাইন পাতার জন্য মোর্সকে ৩০,০০০ ডলার অনুদান মঞ্জুর করেন। এতে মোর্সের আর্থিক কষ্ট দূর হয়। এই সময় দেশ-বিদেশের গণ্যমান্য লোকেরা মোর্সকে অভিনন্দন জানাতে থাকেন।

১৮৪৪ সালের ২৪শে মে।

এটি মোর্সের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। কারণ এইদিন তিনি তাঁর টেলিগ্রাফ যন্ত্রের মাধ্যমে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোরে একটি সংবাদ সার্থকভাবে প্রেরণ করেন। সেই সংবাদটি হলো 'ভগবান কি বানিয়েছেন!'

মোর্স আজ ইহলোকে নেই। ১৮৭২ সালে একাশী বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন। কিন্তু বার্তা প্রেরণের ইতিহাসে তাঁর আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ যন্ত্র রেখে গেছে এক চিরস্থায়ী স্বাক্ষর। আজীবন শিল্পচর্চা করে গেলেও মানুষ কিন্তু চিত্রশিল্পী হিসাবে স্যামুয়েল মোর্সকে চেনে না—চেনে টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা বৈজ্ঞানিকরূপে।

—
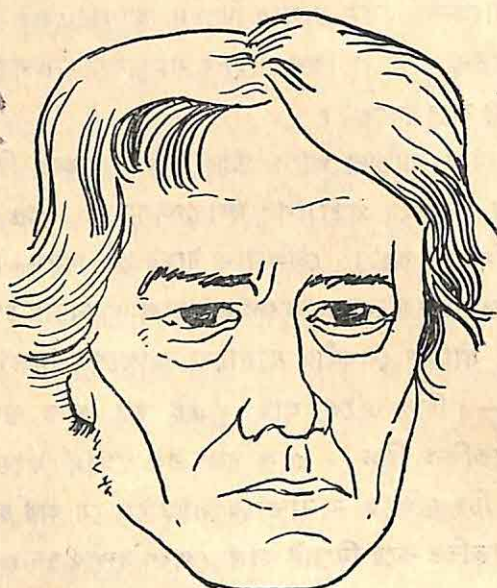
মাইকেল ফ্যারাডে

(খ্রীষ্টাব্দ ১৭৯১—১৮৬৭)

প্রতিভা থাকলে মানুষ স্কুল-কলেজের শিক্ষা না পেয়েও যে বিশ্ববিখ্যাত হতে পারে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ 'মাইকেল ফ্যারাডে'। ইনি ছিলেন এক কামারের ছেলে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডনের কাছে এক গ্রামে এঁর জন্ম হয়। গরীব হলেও কামার তাঁর ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করেছিলেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেও বালক মাইকেল বেশ পড়াশুনা করছিলেন। কিন্তু এক নিষ্ঠুর মাষ্টারমশাইয়ের দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে না পারায় মাইকেলের পড়াশুনায় ছেদ পড়ল অসময়ে। স্কুলের গণ্ডী তিনি পার হতে পারলেন না।

মাত্র তেরো বছর বয়সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ফ্যারাডে ভবঘুরে ছেলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। লণ্ডনে তখন 'জর্জ রিবাউ' নামে এক পুস্তক

বিক্রেতা ছিলেন। ভবঘুরে ফ্যারাডে এই ভদ্রলোকের সুনজরে পড়ে গেলেন। জর্জ রিবাউ ফ্যারাডেকে বিনা পারিশ্রমিকে বই বাঁধানো শিখিয়ে দিলেন।

জর্জ রিবাউ-এর বই বাঁধানোর দোকানে বালক ফ্যারাডে বই বাঁধানোর কাজ করতে লাগলেন। বাঁধানোর জন্য যে সব বই দোকানে আসত, ফ্যারাডে সেগুলো যত্নসহকারে পড়ে ফেলতে লাগলেন। বিদ্যুৎ আর রসায়ন বিদ্যার বই পড়তে তাঁর খুব ভাল লাগত।

দেখতে দেখতে কয়েকটি বছর কেটে গেল। ফ্যারাডে এখন আর ছোট ছেলেটি নন—বিশ বছরের যুবক। একদিন দোকানে বসে এই যুবক বিদ্যুৎ সম্পর্কে লেখা একখানি বই খুব মন দিয়ে পড়ছিলেন। হঠাৎ সেখানে এক খরিদ্দার এলেন। সাধারণ খরিদ্দার নন। লেখাপড়া জানা মস্ত পণ্ডিত খরিদ্দার। ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য তিনি। খরিদ্দার ভদ্রলোক দেখলেন যে এক সামান্য দপ্তরী আগ্রহের সঙ্গে বিজ্ঞানের একখানা দুরূহ বই পড়ছে। তাই দেখে তিনি খুব খুশী হলেন। নামধাম জিজ্ঞাসা করার পর ভদ্রলোক ফ্যারাডেকে উপহার দিলেন চারখানি টিকিট। সিনেমা বা থিয়েটারের টিকিট নয়—বক্তৃতা শোনার টিকিট।

কার বক্তৃতা? কি বিষয়ের বক্তৃতা?

হ্যাঁ, সেই কথাই এখন বলছি।

তখনকার দিনে ইংলণ্ডে 'ডেভি' নামে একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি ভাল বক্তৃতা দিতেও পারতেন। বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়-গুলিকে সহজ ভাষায় বেশ গুছিয়ে বলতে পারতেন। বক্তা তিনিই। লণ্ডন শহরে চারদিন তিনি বক্তৃতা দেবেন। সেই বক্তৃতা শুনতে হলে টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হবে। খরিদ্দার বাবুটি ডেভির বক্তৃতা শুনবার চারখানি টিকিট কিনে উপহার দিলেন ফ্যারাডেকে।

ফ্যারাডে চারদিন খুব মন দিয়ে বৈজ্ঞানিক ডেভির বক্তৃতা শুনলেন। শুধু যে শুনলেন তা নয়—বক্তৃতার সারাংশ সংক্ষেপে নিজের নোট বইতে লিখে রাখলেন। ফ্যারাডের খুব ভাল লাগল ডেভির বক্তৃতা। ডেভি তখন ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি। মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক। খুব নাম-ডাক। ফ্যারাডের বড় ইচ্ছা হলো ওঁর অধীনে কাজ করার। এই ইচ্ছার কথা ডেভিকে তিনি চিঠি লিখে জানালেন। আর সেই

চিঠির সঙ্গে পাঠালেন ডেভির বক্তৃতার সারাংশ—যা তিনি নোট বইতে টুকে রেখেছিলেন।

কয়েকদিন বাদে ফ্যারাডের দপ্তরীখানার সামনে এক জুড়ি গাড়ী এসে দাঁড়াল। ডেভি স্বয়ং এলেন ফ্যারাড়ের সঙ্গে দেখা করতে। ফ্যারাডেকে তিনি বললেন ঃ তোমার নোটগুলো নির্ভুল তো বটেই, ভাষাও সুন্দর। তোমার আবেদন আমি মঞ্জুর করলাম। এখন থেকে তুমি আমার গবেষণাগারে কাজ করবে। মাইনে পাবে—সপ্তাহে পঁচিশ শিলিং।

ডেভির গবেষণাগারে বোতল ধোওয়ার কাজ করতে লাগলেন ফ্যারাডে। প্রতিভা থাকলে তার স্ফুরণ হবেই। ফ্যারাডেরও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটল ডেভির গবেষণাগারে এসে। সামান্য কাজ থেকে শুরু করলেও ফ্যারাডে একদিন ডেভির সহকারীর পর্যায়ে উন্নীত হলেন। গুরুর সঙ্গে বিদেশ সফর করে এলেন। অবশেষে একদিন গুরুকে বলতে শোনা গেল ঃ ফ্যারাডেই হলো আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার।

ফ্যারাডে ডেভির গবেষণায় সাহায্য করেন, আবার নিজেও স্বাধীনভাবে গবেষণা চালান। রসায়ন, তড়িৎ-রসায়ন, ধাতুবিদ্যা ও তড়িৎ বিজ্ঞান নিয়ে জীবনের বিভিন্ন সময়ে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। মরিচাবিহীন ইস্পাত তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। আবিষ্কার করেন জৈব যৌগ 'বেঞ্জিন'। অনেক গ্যাসকে তিনি তরল করতে সক্ষম হন। সক্ষম হন তড়িৎ-বিশ্লেষণের সূত্রাবলী রচনায় এবং বৈদ্যুতিক মোটরের মূল নীতি নির্ণয়ে। তবে ফ্যারাডের জীবনের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার বোধকরি ডায়নামো বা তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র আবিষ্কার। এই ডায়নামো যন্ত্রটি কেমন তা একটু বলে রাখি।—একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক। তারই দুই মেরুর মাঝখানে তামার তারের একটি কুণ্ডলী। কুণ্ডলীটা এমনভাবে রাখা হয় যে, তারের গায়ে চুম্বকের ঠেকবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তারের এই কুণ্ডলীটাকে ইঞ্জিনের সাহায্যে খুব জোরে ঘোরালে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সে খুব জোরালো বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুতেই পাখা ঘোরে, রেলগাড়ী ও ট্রামগাড়ী চলে, আলো জ্বলে ঘরে ঘরে ও কলকারখানায়।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে মাইকেল ফ্যারাডে যখন তাঁর আবিষ্কৃত এই যন্ত্রের কথা প্রকাশ করলেন, তখন গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। গ্লাডষ্টোন সেদিন ফ্যারাডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ আপনার এই যন্ত্র থেকে

আমাদের কি উপকার হবে বলুন তো ? বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ফ্যারাডে সেদিন জবাব দিয়েছিলেন : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এমন একদিন আসবে, যেদিন আমার এই আবিষ্কারের ফলস্বরূপ আপনি দেশবাসীর কাছ থেকে প্রচুর কর আদায় করতে পারবেন।

ফ্যারাডে ছিলেন নির্লোভ পুরুষ। ডায়নামো যন্ত্র আবিষ্কার করেই তিনি ক্ষান্ত রইলেন। আর্থিক লাভের আশায় যন্ত্রটির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হলেন না। তার বদলে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের কারণ নির্ণয়ে তিনি ব্রতী হলেন। আবিষ্কার করলেন তড়িৎ ও চুম্বকের বলরেখা।

ফ্যারাডের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮২৪ সালে তাঁকে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত করা হলো। শুধু তাই নয়, তাঁর নামকে অমর করে রাখার জন্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ধারণক্ষমতার ব্যবহারিক এককের নাম রাখা হলো 'ফ্যারাড'।

—
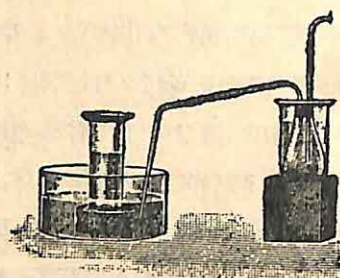
জাস্টাস ভন লিবিগ

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮০৩—১৮৭৩)

বিশ্ববিখ্যাত রসায়নবিদ্ জাস্টাস ভন লিবিগ জার্মানীর 'ডামসার্ড' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওখানে লিবিগের বাবার পেইন্ট ও বার্ণিসের ব্যবসা ছিল।

ছেলেবেলা থেকেই রসায়ণ শাস্ত্রের প্রতি লিবিগের অনুরাগ ছিল বেশী। স্কুলে রসায়নশাস্ত্র বাদে আর সব বিষয়কেই তিনি অবহেলা করতেন, ফলে বিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবন ছিল অসাফল্যে ভরা। কিন্তু পরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি সেই অসাফল্যের কালিমা ঘোচাতে সক্ষম হন। সক্ষম হন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকদের প্রশংসা লাভ করতে।

ছাত্রাবস্থায় লিবিগ তাঁর সহপাঠীদের নিয়ে একটি ছোটখাট 'প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি' গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে তাঁরা সমসাময়িক বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে লিবিগ প্যারিসে যান। সেখানে রসায়নবিদ্যা বিষয়ে বিজ্ঞানী থেনার্ডের এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়ে বিজ্ঞানী গে-লুসাকের বক্তৃতা-মালা শোনেন। ঐ সব বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা শুনে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আকৃষ্ট হন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লিবিগ গাইসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে তিনি একটি গবেষণাগারও গড়ে তোলেন। সেখানে জৈব

যৌগের দহন বিষয়ে তিনি গবেষণা করতে থাকেন। অ্যামিনো অ্যাসিড ও প্রোটিন নিয়ে তাঁর গবেষণাপত্রগুলি বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে প্রশংসা লাভ করে। রাসায়নিক সারের পণ্যোৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে তিনি দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। তাঁরই চেষ্টায় পরীক্ষামূলক জৈব রসায়ন-শাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়।

কর্মজীবনের প্রথম ভাগে লিবিগ রঞ্জন দ্রব্য ও বার্ণিস নিয়ে কিছু কিছু গবেষণা করেছিলেন। গবেষণার ফলে যে সব ছোটখাট আবিষ্কার হয়েছিল, তার স্বত্ব তিনি অর্থের বিনিময়ে বিক্রী করে দিয়েছিলেন।

বক্তৃতা আলোচনা ও গবেষণা করেই লিবিগের কর্মজীবন কেটে যায়। জীবনে তিনি প্রচুর গবেষণাপত্র প্রকাশ করে গেছেন। নিজের মতবাদকে লিবিগ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতেন সত্যি, কিন্তু সেই মতবাদ যে ভ্রান্ত, তার প্রমাণ মিললে তৎক্ষণাৎ অক্লেশে বর্জন করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

একবার নিজের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করে লিবিগ জৈব রসায়নবিদ্যার একটি প্রকল্প রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালের গবেষণার সেই প্রকল্পটি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। আর লিবিগও তাঁর ভুল সহজেই স্বীকার ক'রে নেন। সহজেই নিজের দোষ-ত্রুটি স্বীকারের এই যে ক্ষমতা—লিবিগের চরিত্রের এটাই ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাধুর্য।

অ্যালকোহলের সন্ধানক্রিয়া সম্পর্কে লিবিগ এবং বিজ্ঞানী পাস্তুর সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। জীবিত অবস্থায় এই দুজনের মধ্যে কেউই জেনে যেতে পারেননি যে, কার মতবাদটি সঠিক। কিন্তু তাঁদের সেই মতবিরোধই বিংশ শতাব্দীতে 'বায়োকেমিস্ট্রী' নামে বিজ্ঞানের একটি শাখা গড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে রসায়নবিদ্‌দের মধ্যে লিবিগ ছিলেন সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন। গুরুর অসমাপ্ত কাজকে সেই সব ছাত্রেরাই সম্পূর্ণ করে গেছেন। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে অনেকেই নোবেল পুরস্কার লাভ করে গুরুর সুনাম রক্ষা ও গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন।

—
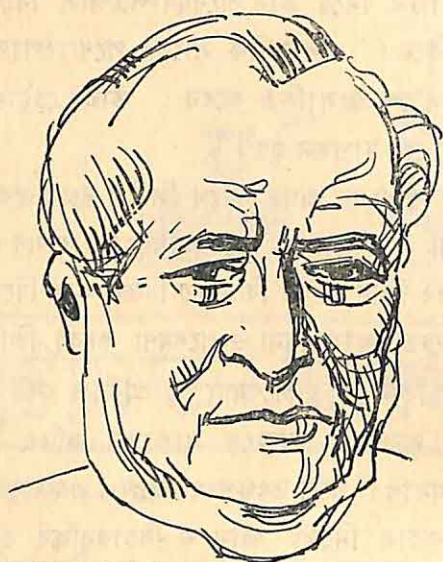
রবারট উইলহেল্‌ম বুনসেন

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮১১—১৮৯৯)

রসায়ন বিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের কাছে 'বুনসেন দীপ' নামটি খুবই পরিচিত। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই যে, এই দীপের আবিষ্কর্তা হলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী 'মাইকেল ফ্যারাডে'। রবার্ট উইলহেল্‌ম বুনসেন সর্বদা এই দীপটি ব্যবহার করতেন বলে তাঁরই নামানুসারে এর নাম রাখা হয়েছে 'বুনসেন দীপ'।

কিন্তু কে এই 'বুনসেন' ?

ইনি ছিলেন প্রখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্‌ ও আবিষ্কর্তা। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ তারিখে জার্মানীর গোটিন্‌জেন শহরে ওঁর জন্ম হয়।

ছেলেবেলা থেকেই বুনসেন ছিলেন গোঁয়ার গোবিন্দ প্রকৃতির। একগুঁয়ে ছেলেটিকে নিয়ে তাঁর পিতামাতা ও শিক্ষকগণের ভাবনার অন্ত ছিল না। কিন্তু একগুঁয়ে এই ছেলেটির একটি সদ্‌গুণ ছিল। যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি করতে এই ছেলেটি

ছিল সিদ্ধহস্ত।

বিজ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি থাকায় বুনসেন ছেলেবেলায় রসায়নবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, মণিকবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যা ভালভাবে আয়ত্ত করেন এবং মাত্র উনিশ বছর বয়সেই ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্রাবস্থায় আলোক ও তাপ বিজ্ঞানে অনুরাগী ছিলেন বুনসেন। আর জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি ব্যয় করেছিলেন বিজ্ঞানের ঐ দুটি শাখার রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

তখনকার দিনে বিদেশ ঘুরে না এলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যেত বলে মনে করা হতো। ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করার পর বুনসেন তাই বিদেশ ভ্রমণে বেরুলেন এবং দু' বছর পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে বেড়ালেন। বহু অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। তারপর দেশে ফিরে এসে কর্মজীবন শুরু করলেন গোটিনজেন-এ অধ্যাপকরূপে।

১৮৩৪ থেকে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বুনসেন গবেষণা চালালেন একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে। সেই উদ্দেশ্য হলো—জৈব যৌগের ধর্ম যে সেই যৌগের মূলকের ধর্মের উপর নির্ভরশীল—তা প্রমাণ করা। এই সময় আর্সেনিক নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তার বিষক্রিয়ায় বুনসেন প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন। আবার ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গবেষণাগারে এক নিদারুণ বিস্ফোরণে বুনসেন তাঁর একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন।

এইসব দুর্ঘটনার পরও বুনসেন কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি। বরং তিনি আর্সেনিকের বিষক্রিয়া প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছিলেন। তাতে সফলও হয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, সোদক ফেরিক অক্সাইড যৌগটি আর্সেনিকের বিষক্রিয়া প্রতিরোধে সক্ষম।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বুনসেন জার্মানীর ক্যাসেল নামক স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী উলারের স্থলাভিষিক্ত হন। তারপর ১৮৪১ সালে 'মারবুর্গ' ও আরও পরে ব্রেসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। ১৮৪১ সালে তিনি 'বুনসেন সেল' নামে উন্নত ধরনের তড়িৎকোষ প্রস্তুত করেন। এর তিন বছর পরে তিনি 'ফটোমিটার' যন্ত্র নির্মাণ করেন। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে বুনসেন বাতির দীপনমাত্রা মাপতে সক্ষম হন।

আগেই বলেছি যে, তাপ বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বুনসেন। সেই অনুরাগের বশবর্তী হয়ে ১৮৪৬ সালে তিনি আইসল্যাণ্ডে যান এবং

সেখান থেকে শতাধিক গ্যাস ও উষ্ণ প্রস্রবণের জলের নমুনা সংগ্রহ করে আনেন ও তা নিয়ে নানারকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালান।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বুনসেন হেইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন। জৈব এবং বিশ্লেষণাত্মক রসায়নবিদ্‌রূপে তাঁর খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রেরা এসে ভিড় করে তাঁর কাছে।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাথিসেন-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে বুনসেন ধাতব লিথিয়াম নিষ্কাশনে সক্ষম হন। আবার ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী কার্শফ-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি 'স্পেকট্রোস্কোপ' যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে আলোককে প্রতিসরিত করে তাকে উপাদান বর্ণগুলিতে বিভক্ত করা সম্ভব হয়। আবার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ যন্ত্রের সাহায্যেই বর্ণালী বিশ্লেষণ করে বুনসেন সিজিয়াম ও রুবিডিয়াম নামে দুটি নতুন মৌল আবিষ্কার করেন।

বুনসেনের আবিষ্কার অভিযান এইখানেই শেষ হয়নি। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ফিল্টার-পাম্প' আবিষ্কার করে রসায়নাগারে দ্রবণ পরিষ্কার করবার উপায় উদ্ভাবন করেন। বৃহদায়তনে ম্যাগনেসিয়াম উৎপাদনের উপায়ও তিনি উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া গলিত ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ করে বুনসেন ক্রোমিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ নিষ্কাশন করতেও সক্ষম হন।

১৮৫২ থেকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত বুনসেন হেইডেলবার্গে রসায়নের অধ্যাপকরূপে গৌরবের সঙ্গে কাজ করে যান। অকৃতদার এই বিজ্ঞানী সারা জীবন ধরে যে সব আবিষ্কার করে গেছেন, সেগুলি পরবর্তী-কালের বিজ্ঞানীদের গবেষণার পথকে প্রশস্ত করেছে।

জার্মানী তার এই মহান সন্তানকে হারায় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে—'প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসূতি'। এই প্রবাদ বাক্যটির প্রতিফলন দেখা যায় প্রখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ রবার্ট উইলহেল্ম বুনসেনের জীবনে।

—
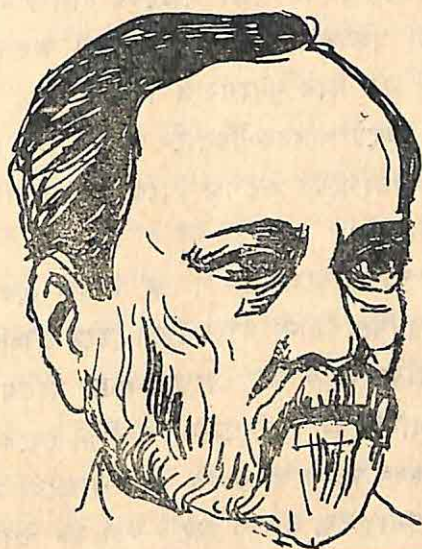
লুই পাস্তুর

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮২২—১৮৯৫)

ডিসেম্বর ২৭, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ।

ঐ দিনটিতে ফরাসী দেশের 'ডোল' শহরে লুই পাস্তুরের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন সৈনিক। সৈনিকের ছেলে কিন্তু বড় হয়ে সৈনিক হননি, হয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত এক বৈজ্ঞানিক।

স্কুলে পাস্তুর মোটেই উঁচুদরের ছাত্র ছিলেন না। আর বিজ্ঞানের চাইতে কলা বিদ্যাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল বেশী। কিন্তু প্যারিসে কলেজে পড়বার সময় কয়েকজন খ্যাতনামা রসায়নবিদ্ অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিজ্ঞানের স্নাতক হওয়ার পর তিনি রাসায়নিক স্ফটিক নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। এই সময় জার্মান রসায়নবিদ্ 'মিতসারলিকোর ধাঁধা'র সমাধান করে পাস্তুর বিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। কারণ এই ধাঁধাটি বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ রসায়ানবিদ্‌দের কাছে মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। বড় বড়

বিজ্ঞানীরা ঐ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিলেন।

এই সাফল্যের পর পস্তুর স্ফটিকের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে গবেষণা করতেন এবং 'ডিজন্'-এর মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যাপনা করতেন। সেখান থেকে তিনি চলে যান স্ট্র্যাসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে। এই সময়ে গবেষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন।

এরপর পাস্তুর চলে যান 'লিল্লে' নামক একটি স্থানে। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি রসায়ন বিদ্যা ছেড়ে জীববিদ্যার গবেষণায় মগ্ন হন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মাঝখানে। কাছেই কয়েকটি মদের কারখানা ছিল। সেখানে বিট-চিনি থেকে মদ প্রস্তুত করা হতো। একদিন একদল মদ্য প্রস্তুতকারক এসে পাস্তুরের সঙ্গে দেখা করল। তারা পাস্তুরকে জানাল যে, তাদের প্রস্তুত করা মদ প্রায়ই টকে গিয়ে নষ্ট হয়। তার ফলে তারা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই তরুণ অধ্যাপককে তারা মদ টকে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে লোকসানের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার অনুরোধ জানাল।

পাস্তুর তাদের অনুরোধমত অনুসন্ধানে রত হলেন। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ মদ পরীক্ষা করে পাস্তুর ওতে ব্যাকৃটিরিয়ার সন্ধান পেলেন। তাঁর ধারণা হলো যে, ঐ ব্যাকটিরিয়াগুলিই মদকে খারাপ করে দেয়। গবেষণা করে তিনি ঐ ব্যাকটিরিয়াদের বিনাশের ব্যবস্থা করলেন। মদ প্রস্তুতকারকদের বললেন ঃ তোমরা মদকে ১২০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণতায় উত্তপ্ত কর। তাহলে ব্যাকটিরিয়াগুলো মরে যাবে, আর তাতে মদের স্বাদ ও ধর্মেরও কোন পরিবর্তন ঘটবে না। মদ প্রস্তুতকারকরা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল। ফরাসী দেশের মদ্যশিল্প বাঁচল ধ্বংসের হাত থেকে। পাস্তুর পরে দুধকে জীবাণুমুক্ত করার জন্যও ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করে সুফল পেলেন। তাঁর নামানুসারে ঐ পদ্ধতির নাম দেওয়া হলো 'পাস্তুরীকরণ'।

ফরাসী দেশের মদ্যশিল্পকে এইভাবে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তৎকালীন ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ও সম্রাজ্ঞী ইউজেনি খুব খুশী হয়ে পাস্তুরকে তাঁদের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে আদর-

আপ্যায়ন করলেন এবং তাঁর জন্য একটি ভাল গবেষণাগার নির্মাণের উদ্দেশ্যে ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ ব্যয় করতে সম্মত হলেন।

ফরাসী দেশ ঐ সময় রেশম শিল্পে বেশ উন্নত ছিল। রেশম শিল্পের জন্য ও-দেশে গুটিপোকার চাষ করা হতো। কিন্তু ১৮৬৫ সালে ফরাসী দেশে গুটিপোকার মড়ক লাগে। তার ফলে সেখানকার রেশম শিল্প বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তখন ডাক পড়ে পাস্তুরের। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাস্তুর গুটিপোকার মড়কের কারণ খুঁজে পেলেন এবং প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও করলেন। গুটিপোকার মড়কের মূলে আছে জীবাণু। সেই জীবাণুদের পাস্তুর চিনে নিলেন। চাষীদেরও চেনালেন। ঐ জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত গুটিপোকাগুলিকে পুড়িয়ে ফেলার পরামর্শ দিলেন পাস্তুর। চাষীরা তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করায় গুটিপোকার মড়ক বন্ধ হলো। ফ্রান্সের রেশম শিল্প বাঁচল।

এই সময় ফরাসী দেশে 'চিকেন কলেরা' নামে এক মারাত্মক রোগে লক্ষ লক্ষ বাচ্চা মুরগী মরে যাচ্ছিল। চিকেন পালকরা পাস্তুরের সাহায্য ভিক্ষা করল। পাস্তুর এগিয়ে এলেন তাদের সাহায্য করতে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখলেন যে, রোগাক্রান্ত মুরগীর বাচ্চার রক্তে এক শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া সাঁতরে বেড়াচ্ছে। পাস্তুর ঐ ব্যাকটিরিয়াদের সংগ্রহ করলেন। তাদের দুর্বল করে সুস্থ মুরগীর বাচ্চার দেহে ইনজেকশন করে ঢুকিয়ে দিলেন। ফলে টিকা দেওয়া বাচ্চাগুলির কলেরা রোগ হলো না। চিকেন কলেরা রোগের কবল থেকে বাঁচল ফরাসী দেশের কোটি কোটি মুরগীর বাচ্চা।

গরু-মোষ-ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর এই সময় 'অ্যানথ্রাক্স' রোগ হতো। এই রোগে বহু গৃহপালিত পশু মারা যেতো। একবার তাদের দেহে রোগ সংক্রামিত হলে পাস্তুর আর তাদের রোগমুক্ত করতে পারতেন না বটে, তবে যাতে তারা এই রোগে আক্রান্ত না হয় তার ব্যবস্থা করতে পারতেন টিকা দিয়ে। পাস্তুর অ্যানথ্রাক্স রোগের দুর্বল-করা ব্যাকটিরিয়া দিয়ে টিকা দিতেন। তার ফলে গৃহপালিত পশুরা ঐ রোগের মারাত্মক আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতো।

রোগ প্রতিরোধের জন্য জন্তুদের টিকা দিয়ে অসামান্য সাফল্য লাভ করায় পাস্তুর খুব আনন্দিত হন এবং টিকার মাধ্যমে মানুষের রোগ

প্রতিরোধ করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। তখনও জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। পাস্তুর যখন বালক মাত্র, তখন একবার তাঁর গ্রামের আটজন লোক পাগলা নেকড়ের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ঐ রোগীদের আর্ত চীৎকার বালক পাস্তুর শুনেছিলেন। তাতে তিনি বিচলিতও হয়েছিলেন। তাই বড় হয়ে সেই জলাতঙ্ক রোগের কথাটাই তাঁর মনে পড়ল সবার আগে। মানুষকে কি টিকা দিয়ে জলাতঙ্ক রোগের কবল থেকে বাঁচানো যায় না ?

আরম্ভ হলো পাস্তুরের গবেষণা।

পাগলা হিংস্র কুকুর নিয়ে গবেষণা।

পাস্তুর কৌশলে ঐ সব পাগলা কুকুরের মুখের লালা সংগ্রহ করতেন। কারণ সেই লালাতেই আছে বিষাক্ত ভাইরাস—যা জলাতঙ্ক রোগ ঘটিয়ে থাকে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পাস্তুর সেই ভাইরাসকে দুর্বল করতে সক্ষম হন। সক্ষম হন তাই দিয়ে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রস্তুত করতে। পাস্তুর দেখেছিলেন যে, সুস্থ কুকুরকে ঐ টিকা দিলে কুকুরটি জলাতঙ্ক রোগের প্রতিরোধক শক্তি লাভ করে। এরপরে পাগলা কুকুরে তাকে কামড়ালেও সে অসুস্থ হয়ে পড়ে না। কিন্তু এ টিকা কি মানুষকেও দেওয়া চলবে? দিলে কি তাতে সুফল পাওয়া যাবে ?—এই সব কথা দিনরাত ভাবতেন পাস্তুর।

এমন সময় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে একদিন 'যোশেফ মাইস্টার' নামে ন' বছরের একটি ছেলেকে পাগলা কুকুরে কামড়ায়। কুকুরের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ছেলেটিকে নিয়ে তার মা উদ্বিগ্ন চিত্তে লুই পাস্তুরের গবেষণাগারে এসে উপস্থিত হন। তিনি কার কাছে নাকি শুনেছিলেন যে, পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগ সারাবার চিকিৎসা জানেন।

যাই হোক, পাস্তুর ছেলেটিকে পরীক্ষা করলেন। ভাবলেন—টিকা দেবেন, কি দেবেন না। না দিলে ছেলেটি জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবেই। আবার যে টিকা কুকুরকে দিয়ে সুফল পাওয়া গেছে, তা মানুষকে দিয়ে সুফল পাওয়া যাবে কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তবুও দেখা যাক একবার শেষ চেষ্টা করে—এই ভেবে ছেলেটির মায়ের অনুমতি নিয়ে পাস্তুর যোশেফ মাইস্টারের চিকিৎসা শুরু করে দিলেন।

ওষুধে কাজ হলো। ছেলেটির আর জলাতঙ্ক রোগ হলো না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, সেদিন প্রথম প্রমাণিত হলো যে, টিকা দিয়ে মানুষকেও জলাতঙ্ক রোগের কবল থেকে বাঁচানো যায়।

একের পর এক এইসব বড় বড় আবিষ্কারের ফলে পাস্তুরের যশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। ফরাসী দেশে যত রকমের পুরস্কার ও সম্মান ছিল—সবই পাস্তুর পেলেন। প্রভূত অর্থ ও খ্যাতি। কিন্তু সে-সবে তাঁর চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটল না। রোগ নিরোধ করে রোগার্তদের যন্ত্রণা দূর করার ব্রতে তিনি অটুট হয়ে রইলেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে গেলেন। পাস্তুর বলতেন ঃ অভিধানের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো ইচ্ছা, কাজ আর সফলতা। এই তিনটি গুণই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল পাস্তুরের মধ্যে। তাই তো তিনি এত বড় বৈজ্ঞানিক হতে পেরেছিলেন।

—
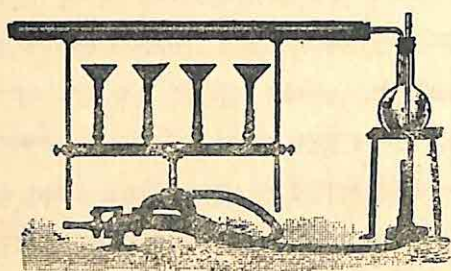
আলফ্রেড বারণার্ড নোবেল

[খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩৩-১৮৯৬]

পৃথিবীর নানা দেশে নানা ধরনের পুরস্কারের প্রচলন আছে, কিন্তু নোবেল পুরস্কারের মত সম্মানজনক পুরস্কার জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। নোবেল পুরস্কার মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কার। যে মনীষীর সঞ্চিত অর্থ থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁর নাম 'আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল'। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সুইডিশ রসায়নবিদ্ ও উদ্ভাবক।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর তারিখে আলফ্রেড নোবেলের জন্ম হয় সুইডেনের ষ্টকহোল্ম শহরে। ইম্যানুয়েল নোবেলের তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। শৈশবকালে আলফ্রেডের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। তাই তিনি প্রধানতঃ গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বাড়ীতে বসেই লেখাপড়া করতেন। যখন তাঁর বয়স নয় কি দশ বছর, তখন তাঁর পিতামাতা তাঁকে রাশিয়ায় নিয়ে যান। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্স্‌বার্গ গিয়ে ইম্যানুয়েল নোবেল সেখানে টর্পেডো ও মাইন তৈরির একটা কারখানা স্থাপন করেন। আলফ্রেড ছেলেবেলা থেকেই সেই কারখানায় শিক্ষানবিশী শুরু করেন এবং অচিরেই টর্পেডো ও মাইন তৈরি করতে শিখে ফেলেন। এই সময় আলফ্রেডের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং তিনি বলিষ্ঠ ও কর্মঠ হয়ে ওঠেন, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কাজ তাঁর ভাল লাগেনি।

আলফ্রেড ঐ সময় জার্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যের নানা স্থানে ঘুরে নিজের চেষ্টায় রসায়ন ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পরিবার রাশিয়া ছেড়ে চলে আসেন স্বদেশে—সুইডেনে। পিতামাতার সঙ্গে আলফ্রেডও চলে আসেন ষ্টকহোল্‌মে।

তখনকার দিনে পাহাড়ী অঞ্চলে রাস্তা ও রেলপথ তৈরি করতে হলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পাথর কেটে তা তৈরি করতে হতো। এ কাজ ছিল দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ও ক্লান্তিকর। পাহাড় ফাটাবার জন্য তখন একমাত্র বিস্ফোরক পদার্থ ছিল 'বারুদ'। কিন্তু বারুদের ক্ষমতা সীমিত। সর্বক্ষেত্রে বারুদকে কাজে লাগানো যেতো না। অবশ্য আর একটা তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ তখন সবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। নাম তার 'নাইট্রোগ্লিসারিন'—ফিকে হলুদ রঙের তরল পদার্থ। একটু নাড়াচাড়া বা গরম করলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যায়। কাজেই নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহার করা তখন নিরাপদ ছিল না।

আলফ্রেড ষ্টকহোল্‌মে ফিরে এলে পর অধ্যাপক জিনিন্ তাঁকে নাইট্রোগ্লিসারিন নামক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থটি নিয়ে গবেষণা করতে পরামর্শ দেন এবং তা আলফ্রেডের মনঃপূত হয়। তিনি নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন।

গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়েই এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সেই দুর্ঘটনায় আলফ্রেডের ছোট ভাই এমিল সমেত আরও পাঁচ ব্যক্তি মারা যায়। তাছাড়া গবেষণাগারের বেশ কিছুটা অংশ উড়ে যায় বিস্ফোরণের ফলে। এই দুর্ঘটনার পর সুইডেন সরকারের আদেশে শহরের মধ্যে নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়ে পরীক্ষার কাজ আলফ্রেডকে বন্ধ করতে হয়। কিন্তু আলফ্রেড তাতে নিরুৎসাহ হননি। তিনি একটি বড় নৌকা ভাড়া করেন। সেই নৌকার মধ্যে গবেষণাগার সাজিয়ে সেটিকে নিয়ে যান শহর থেকে দু'মাইল দূরে ম্যালার হ্রদের মাঝে। সেইখানেই আবার শুরু করেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অবশ্য কিছুকাল পরে আবার তিনি ষ্টকহোল্‌ম শহরেই গবেষণা করার অনুমতি পান। এইখানেই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুষ্ঠুভাবে বিস্ফোরণ ঘটাবার একটি কৌশল (ডিটোনেটর) উদ্ভাবন করেন।

একদিন গবেষণাগারে নোবেলের এক সহকর্মী নাইট্রোগ্লিসারিনের

বোতল বিদেশে পাঠাবার জন্য প্যাক করছিলেন। হঠাৎ তাঁর হাত ফসকে একটি বোতল মেঝেতে পড়ে গেল। মেঝেতে ছড়ানো ছিল এক বিশেষ ধরনের মাটি—যা প্যাকিংয়ের কাজে লাগতো। বিস্ফোরক বোঝাই বোতলটা পড়লো গিয়ে সেই মাটির ওপর। তাই না দেখে গবেষণাগারের সবাই তো ভয়ে অস্থির! এই বুঝি বিস্ফোরণ ঘটে আর কি! আলফ্রেড নোবেলও একটু দূরে দাঁড়িয়ে এ সব দেখছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার বিস্ফোরণ ঘটলো না।

আলফ্রেড ঐ মাটি সমেত নাইট্রোগ্লিসারিন সাবধানে তুলে এনে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, নাইট্রোগ্লিসারিনের বিস্ফোরণ ক্ষমতা একটুও কমেনি, কিন্তু মাটির সঙ্গে মিশে জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে গেছে বলে নাড়াচাড়া করবার পক্ষে জিনিসটা বেশ নিরাপদ হয়েছে।

এই আকস্মিক ব্যাপারে আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছাকে অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ণ করে দিল। তিনি নাইট্রোগ্লিসারিনকে নিরাপদে ব্যবহার করার একটা উপায় খুঁজে পেলেন। আরও পরীক্ষা চালিয়ে নোবেল 'কিসেলগার' নামে একরকম সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট বেলেপাথর নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দেখলেন যে, তাতে মিশ্রণটা বেশ কঠিন হয়। তাছাড়া নাইট্রোগ্লিসারিনের বিস্ফোরণ শক্তিও কমে না অথচ তা নিরাপদে নাড়াচাড়া করা যায়। নোবেল এরই নাম দিলেন 'ডিনামাইট'। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিনামাইট আবিষ্কৃত হলো। নিরাপদে ও সহজে পাহাড় ফাটাবার ও পাহাড়ে সুড়ঙ্গ করবার উপায় খুঁজে পেলো মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে নোবেলের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। ডিনামাইট বিক্রী করে নোবেল অগাধ সম্পত্তির মালিক হলেন। অর্থ ও যশ কিন্তু নোবেলের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে প্রভাবিত করতে পারলো না। তিনি বিস্ফোরক সম্পর্কে আরও গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। শেষে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করলেন আর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ—নাম তার 'ব্যালিষ্টাইট'। এই প্রথম ধূম্রবিহীন বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কৃত হলো।

সারা জীবন বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে গবেষণা করে গেলেও নোবেল অবসর সময়ে কাব্যচর্চা করতে ভালবাসতেন। তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন যে বিস্ফোরক পদার্থ যেন ধ্বংসের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত না হয়ে মানুষের কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত হয়। তাই তিনি শান্তির জন্যও নোবেল

পুরস্কারের ব্যবস্থা করে যান।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আলফ্রেড নোবেল 'নোবেল পুরস্কার' সংক্রান্ত একটি উইলে সই করে যান। সেই উইলের শর্ত অনুসারে তাঁর তহবিলের সুদ থেকে প্রতি বছর পাঁচটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দানের ব্যবস্থা হয়। স্থির হয়—পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, শারীর বিদ্যা বা চিকিৎসা বিদ্যা, সাহিত্য এবং বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের অধিকারীকে প্রতি বছর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে।

আলফ্রেড নোবেল ইহলোক ত্যাগ করেছেন অনেকদিন আগে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে, কিন্তু 'নোবেল পুরস্কার' তাঁর পুণ্য স্মৃতিকে চির জাগরূক করে রেখেছে।

—
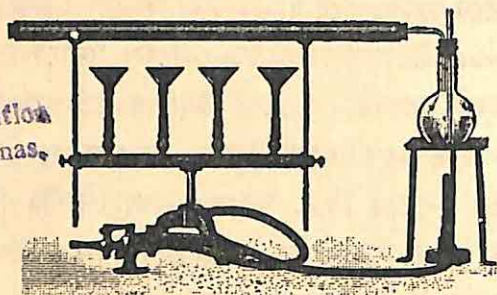
রবার্ট কখ্

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৪৩—১৯১০)

জীবাণু সম্পর্কে গবেষণা করে যে ক'জন বিজ্ঞানী বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন, রবার্ট কখ্ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। জার্মানীর ক্লাউসথাল্ শহরে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট কখের জন্ম হয়। আসলে কখ্ ছিলেন একজন জার্মান চিকিৎসক। জার্মানীর একটি ছোট শহরে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। নামডাক তেমন ছিল না। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন কিন্তু উপার্জন ছিল কম। ফলে এই চিকিৎসকের জীবনে এসেছিল নৈরাশ্য। কিন্তু সামান্য একটি ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল। চিকিৎসককে গড়ে তুললো জীবাণু-বিজ্ঞানী রূপে।

প্রতি বছরই স্বামীর জন্মদিনে শ্রীমতী কখ্ স্বামীকে একটা কিছু উপহার দিতেন। সেবার তিনি উপহার দিলেন একটি অভিনব জিনিস—একটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র। উপহার পেয়ে ডাক্তার কখ্ খুব খুশী হলেন। হাতের কাছে যা পেলেন তাই ঐ যন্ত্রের লেন্সের তলায় ফেলে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। যতই দেখেন ততই তাঁর কৌতূহল বাড়তে থাকে। শেষে এমন হলো যে রোগী দেখা বন্ধ করে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে তিনি দিনরাত অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে বসে রইলেন। শ্রীমতী কখ তাতে বিরক্তই হলেন। কিন্তু তখন তিনি ভাবতেও পারলেন না যে তাঁর স্বামী হতে চলেছেন এক জগদ্বিখ্যাত জীবাণু-বিজ্ঞানী।

ডাক্তার কখের রোগী দেখার ঘরটি মোটামুটি বড়ই ছিল। তিনি

দেওয়াল তুলে ঘরটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করলেন। এক ভাগ রইলো রোগী দেখার ঘর হিসাবে, অন্য ভাগটিতে গড়ে উঠলো ছোটখাটো একটি গবেষণাগার। অনুবীক্ষণ যন্ত্রটি হলো সেই গবেষণাগারের প্রাণ।

ঐ সময় অ্যানথ্রাক্স রোগে দেশের অনেক গৃহপালিত পশু মারা যেতো। রোগের কারণ অজ্ঞাত থাকায় ঐ রোগের কোন চিকিৎসাও ছিল না। ডাক্তার কখ্ অ্যানথ্রাক্স রোগের কারণ নির্ণয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবনের প্রথম গবেষণা শুরু করলেন।

তিনি অ্যানথ্রাক্স রোগে মরা ভেড়ার দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে তা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় রেখে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, তাতে সরু দণ্ডের আকৃতিযুক্ত অসংখ্য জীবাণু রয়েছে। সুস্থ ভেড়ার রক্তে কখ্ কিন্তু ঐ রকম জীবাণু দেখতে পেলেন না। তাই দেখে কখ্-এর মনে হলো যে ঐ দণ্ডাকৃতি জীবাণুগুলিই নিশ্চয় অ্যানথ্রাক্স রোগের জন্য দায়ী। এই ভেবে কখ্ একটা পরীক্ষা করলেন। তিনি একটি সূঁচ নিলেন। সূঁচটিকে ফুটন্ত জলে ফেলে জীবাণুমুক্ত করে নিয়ে অ্যানথ্রাক্স রোগে মরে যাওয়া একটি ভেড়ার রক্তে ডোবালেন। তারপর সেই সূঁচটিকে ফুটিয়ে দিলেন একটি জ্যান্ত ইঁদুরের দেহে। কয়েকদিনের মধ্যেই ইঁদুরটি অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। সফল হলো কখ্-এর পরীক্ষা। তিনি নিশ্চিত হলেন যে, ঐ দণ্ডাকৃতি জীবাণুগুলিই মারাত্মক অ্যানথ্রাক্স রোগ বিস্তারের জন্য দায়ী।

অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু নিয়ে আরও অনেক পরীক্ষা চালালেন কখ্। তিনি দেখলেন যে খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ থাকলেই ঐ জীবাণুগুলির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই দেখে কখ্ দেশের পশুপালকদের বলে দিলেন—তারা যেন অ্যানথ্রাক্স রোগে মরে যাওয়া পশুগুলিকে পুড়িয়ে ফেলে। তাহলে ঐ জীবাণুরা ধ্বংস হয়ে যাবে—রোগ সংক্রমণের পথ রুদ্ধ হবে।

যক্ষ্মা রোগের কারণ তখনও পর্যন্ত নির্ণীত হয়নি। কখ্ এইবার সেই কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। দীর্ঘ এগারো বছর ধরে অনুসন্ধান করে কখ্ দেখলেন যে, এক বিশেষ ধরনের জীবাণু যক্ষ্মা রোগ বিস্তার করে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কখ্ সেই জীবাণুর আকৃতি ভালভাবে দেখলেন। শুধু তাই নয়—তিনি সেই জীবাণু অন্য অন্য প্রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়ে

দেখলেন যে, সেই প্রাণীগুলিও যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলো। কোন চিকিৎসা না থাকায় রোগাক্রান্ত প্রাণীগুলি মারাও গেল। তখন কখ্ বুঝলেন যে, শুধু মানবদেহে নয়, প্রাণীদেহেও যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রামিত হয়। সংক্রামিত হয় বায়ুবাহিত হয়ে।

অ্যানথ্রাক্স-এর পর যক্ষ্মা। যক্ষ্মার পর কলেরা। কখ্ কলেরার জীবাণুও আবিষ্কার করলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে কলেরা রোগ প্রচণ্ড-ভাবে দেখা দিল। রোগে আক্রান্ত হবার দশ-বারো ঘণ্টার মধ্যেই রোগী মারা যেতে লাগলো। ইউরোপের লোক আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। কখ এ-খবর শুনে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। একজন সহকর্মী আর অনুবীক্ষণ যন্ত্রটি নিয়ে জার্মানী থেকে তিনি মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে উপস্থিত হলেন। যদি কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করা যায়—এই আশায়।

আশা পূর্ণ হলো কখ্-এর।

কলেরা রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে তিনি তাতে কমা (,) আকৃতির এক নতুন ধরনের জীবাণুর সন্ধান পেলেন। আরও পরীক্ষা চালিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, ঐ কমা আকৃতির জীবাণুরা জলবাহিত হয়ে মানুষের পেটে প্রবেশ করে রোগের সংক্রমণ করে।

এমনি ভাবে একের পর এক বিভিন্ন রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেই কখ্ ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি রক্ত থেকে জীবাণুকে পৃথক করার পদ্ধতি ও জীবাণুর বংশবৃদ্ধির উপায়ও নির্ণয় করে গেছেন। তাই কখ্কে বলা হয় 'জীবাণুবিদ্যার জনক'।

বিজ্ঞানী কখ্-এর আবিষ্কারের ফলে এক অদৃশ্য জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছে। মানুষের অদৃশ্য শত্রু জীবাণুদের ধ্বংসের উপায়ও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। মারাত্মক সব ব্যাধির কবল থেকে মানুষকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীবাণু-বিজ্ঞানী সাতষট্টি বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগের পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু মানুষ রবার্ট কখ্কে আজও ভুলতে পারেনি। আমরা চিকিৎসক কখ্কে মনে রাখিনি। মনে রেখেছি জীবাণুবিদ্যার জনক রবার্ট কখ্কে।

—
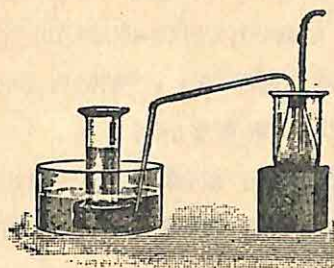
জ্যাকোবাস ভ্যাণ্টহফ্

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫২—১৯১১)

রসায়নবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন যে বিজ্ঞানী, তাঁর নাম 'জ্যাকোবাস ভ্যাণ্টহফ'। ইনি ছিলেন হল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট তারিখে হল্যাণ্ড দেশের রটারডামে ভ্যাণ্টহফের জন্ম হয়। তাঁর পিতা সেখানকার একজন চিকিৎসক ছিলেন। ছেলেবেলায় পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে গানবাজনাও শিখতে থাকেন ভ্যাণ্টহফ। তিনি ভাল পিয়ানো বাজাতে শিখেছিলেন। কয়েকবার সঙ্গীত প্রতি-যোগিতায় যোগ দিয়ে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। লেখাপড়াতেও খুব ভাল ছিলেন কিন্তু বহু চেষ্টা করেও স্কুলের পরীক্ষায় তিনি একটিবারও প্রথম স্থান অধিকার করতে পারেননি।

স্কুলে পড়ার সময়েই ভ্যাণ্টহফ রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। স্কুলে রসায়ন বিদ্যার মাষ্টারমশাই অনেক সুন্দর সুন্দর পরীক্ষা করে দেখাতেন। বালক ভ্যাণ্টহফ তা মুগ্ধ হয়ে দেখতেন আর ভাবতেন: আহা, আমিও যদি অমন সব পরীক্ষা হাতে-কলমে করে দেখতে পারতাম!

এ বয়সে সব ছেলেরই কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকে। ভ্যাণ্টহফেরও তা ছিল। ছুটির দিনে দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিয়ে তিনি স্কুলের রসায়নাগারে ঢুকে পড়তেন। তারপর নানারকম বিষাক্ত পদার্থ, বিস্ফোরক পদার্থ আর র‍্যাকের রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে আপন মনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন।

বেশ কয়েক মাস এমনিভাবে লুকিয়ে পরীক্ষা চালানোর পর একদিন তাঁর সদলবলে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন মাষ্টারমশাইয়ের কাছে। বকুনিও খেলেন খুব। তারপর থেকেই লুকিয়ে রসায়নাগারে ঢুকে কাজ করা তাঁর বন্ধ হয়ে গেল।

তা সত্ত্বেও ভ্যাণ্টহফ নিরুৎসাহ হলেন না। বাবার কাছে টাকাপয়সা চেয়েচিন্তে বাড়ীতেই একটা ছোটখাটো রসায়নাগার বানিয়ে ফেললেন তিনি। তারপর সেখানেই শুরু করে দিলেন পরীক্ষা। রঙ-বেরঙের রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে তিনি মজার মজার পরীক্ষা করতেন আর তা দেখতে বাইরের অনেক ছেলেমেয়ে জড়ো হতো। চতুর ভ্যাণ্টহফ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। প্রত্যেকের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে তবেই তিনি পরীক্ষা দেখাতেন। পরীক্ষা দেখিয়ে যে পয়সা পেতেন, তাই দিয়ে রাসায়নিক দ্রব্য কিনতেন। কিনতেন রসায়নাগারের যন্ত্রপাতি। দেখতে দেখতে ভ্যাণ্টহফের ক্ষুদে রসায়নাগারটি সুন্দরভাবে গড়ে উঠলো। ক্ষুদে রসায়নবিদের মন খুশীতে ভরে উঠলো।

দেখতে দেখতে স্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেল। ভ্যাণ্টহফ ভর্তি হলেন ডেল্‌ফটের পলিটেকনিক ইন্‌স্টিট্যুটে। সেখানে তিনি দু'বছর ধরে শিক্ষালাভও করলেন। এইখানে শিক্ষালাভের সময় একদিন ভ্যাণ্টহফ একটি চিনির কল দেখতে যান। চিনির কল দেখতে গিয়ে কি জানি কেন, মন তাঁর বিরক্তিতে ভরে যায়। কারিগরী রসায়নের প্রতি তাঁর মনে একটা বিতৃষ্ণা আসে।

বিজ্ঞানী হলে কি হবে, ভ্যাণ্টহফ কাব্যপিয়াসীও ছিলেন। কবিতা পড়তে তিনি ভালবাসতেন। ভালবাসতেন কবিতা লিখতেও। বায়রনের কবিতাই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। বন্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখবার সময় প্রায়ই তিনি বায়রনের কবিতার কিছু কিছু স্তবক উদ্ধৃত করতেন। কিছুকাল তিনি বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ 'কেকুলে'র তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেছিলেন। সেই সময় একজন ছাত্রীও কেকুলের গবেষণাগারে কাজ করতো। একদিন সেই ছাত্রীটি আত্মহত্যা করলো। কি কারণে আত্মহত্যা করলো তা জানা গেল না। কিন্তু মেয়েটির দুঃখপূর্ণ জীবনকে উদ্দেশ করে ভ্যাণ্টহফ ইংরেজীতে একটি সুন্দর কবিতা লিখে ফেললেন। সেই কবিতায় ছিল তাঁর হৃদয়ের বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত অঞ্জলি।

এই ঘটনার পর তরুণ ভ্যাণ্টহফের মন বিচলিত হয়ে উঠলো।

কোন কাজেই তিনি মন বসাতে পারলেন না। কিছুদিন এখানে ওখানে ঘুরে অবশেষে তিনি এলেন প্যারিসে। সেখানে বিজ্ঞানী ভোর্ৎজের তত্ত্বাবধানে গবেষণা শুরু করলেন। সহ-গবেষকরূপে পেলেন বিজ্ঞানী 'লা-বেল'কে।

শান্ত ও ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ভ্যাণ্টহফ। পরীক্ষাগারে একমনে তিনি কাজ করে যেতেন। ভোর্ৎজের তত্ত্বাবধানে কাজ করার সময়েই তিনি জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি বললেনঃ জৈব যৌগে কার্বন পরমাণুর চারটি 'ভ্যালেন্সি বণ্ড' আছে। একটি নিয়মিত চতুর্ঘন ত্রিভুজের (রেগুলার টেট্রাহেড্রন) কেন্দ্রে একটি কার্বন পরমাণুকে রাখলে এবং ঐ নিয়মিত চতুর্ঘন ত্রিভুজের চারটি কোণের সঙ্গে কেন্দ্রকে চারটি রেখার দ্বারা সংযুক্ত করলে ঐ রেখাগুলি কার্বন পরমাণুর চারটি 'ভ্যালেন্সি বণ্ড' নির্দেশ করে। এখন যদি ঐ নিয়মিত চতুর্ঘন ত্রিভুজের চারটি কোণের মধ্যে অন্ততঃ ছ'টিতে একই পরমাণু বা পরমাণুসমষ্টি যুক্ত থাকে, তাহলে ঐ কার্বন পরমাণুকে বলা হয় সিমেট্রিক বা সমপরিমিত। অপরপক্ষে কেন্দ্রস্থ কার্বন পরমাণু যদি চারটি বিভিন্ন একযোজী পরমাণু বা পরমাণুসমষ্টির সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে ঐ কার্বন পরমাণুকে বলা হয় অ্যাসিমেট্রিক বা অসম-পরিমিত।

ভ্যাণ্টহফ পরীক্ষা করে দেখলেন যে, যে সমস্ত পদার্থের দ্রবণ একমুখী আলোর তলকে ডানদিকে বা বাঁদিকে ঘোরাতে পারে, তাদের মধ্যে এক বা একাধিক অ্যাসিমেট্রিক কার্বন পরমাণু থাকে। যদি কোন জৈব যৌগে ছুটি অ্যাসিমেট্রিক কার্বন পরমাণু থাকে, তাহলে একটির অবস্থান অপরটির ঠিক বিপরীত হয়, অর্থাৎ একটি হয় অপরটির ঠিক প্রতিবিম্ব। একটি যদি একমুখী আলোক-তরঙ্গের কম্পন তলকে ডানদিকে (ডেক্সট্রো-রোটেটারী) ঘোরায়, তবে অপরটি তাকে সমান ভাবে বাঁ দিকে (লিভো-রোটেটারী) ঘোরাবে।—এই হলো ভ্যাণ্টহফের প্রথম আবিষ্কার।

পরবর্তীকালে ভ্যাণ্টহফ আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে তিনি এখানে অধ্যাপনা করেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলি ঘটে এখানকার গবেষণাগারেই। এইখানেই দ্রবণের প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি

বিখ্যাত হন।

অসমোটিক-চাপ নিরূপণের তিনটি সূত্রকে ভিত্তি করেই তিনি দ্রবণের প্রকৃতি নির্ধারণ করেন। অসমোসিস প্রক্রিয়ায় দ্রাবকের যে গতি দেখা যায়, তাকে সাম্যাবস্থায় আনতে গেলে দ্রবণে যে অতিরিক্ত উদস্থৈতিক চাপের উদ্ভব হয়, তারই নাম 'অসমোটিক-চাপ'। একটি দ্রবণ ও একটি তরল দ্রাবকের মাঝে যদি পার্চমেন্ট কাগজ বা ঐ ধরনের সূক্ষ্ম কোন পর্দা রাখা হয়, তাহলে দ্রাবক ধীরে ধীরে ঐ পদার্থ ভেদ করে দ্রবণের দিকে অগ্রসর হতে থাকে—যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্রাবকের ঐ গতিপ্রবাহকে সাম্যাবস্থায় আনার জন্য দ্রবণের মধ্যে একটি চাপ সৃষ্টি হয়। ঐ চাপই দ্রবণের অসমোটিক-চাপ।

১৮৮৬ সালে ভ্যাণ্টহফ লঘু দ্রবণের অসমোটিক-চাপ সম্বন্ধে তিনটি অতি প্রয়োজনীয় সূত্র আবিষ্কার করেন। সেই সূত্র তিনটি এই রকম :

১। উষ্ণতাকে অপরিবর্তিত রাখলে লঘু দ্রবণের অসমোটিক-চাপ ঘনত্বের আনুপাতিক হয়।

২। ঘনত্বকে অপরিবর্তিত রাখলে লঘু দ্রবণের অসমোটিক-চাপ উষ্ণতার আনুপাতিক হয়।

৩। সমান অণুপরিমিত বিভিন্ন দ্রাব পদার্থকে যদি সমান আয়তন বিশিষ্ট দ্রাবকে দ্রবীভূত করা হয়, তাহলে একই উষ্ণতায় অসমোটিক-চাপ অপরিবর্তিত থাকে।

ভ্যাণ্টহফের এই আবিষ্কারে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের গবেষণার কাজে খুব সুবিধা হয়।

জীবনের শেষ পর্যায়ে ভ্যাণ্টহফ বিভিন্ন জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমি অফ্ সায়েন্সেস্ তাঁকে সেখানে সপ্তাহে একটি করে বক্তৃতা দেবার অনুরোধ জানান এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিন সেখানে তাঁর গবেষণা চালাবার সুবন্দোবস্ত করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বার্লিনের কাছে এক সুন্দর জায়গায় তাঁর জন্য ঐ অ্যাকাডেমি একটি ভাল গবেষণাগার তৈরি করে দেন। জীবনের শেষ দশটি বছর ভ্যাণ্টহফ ঐখানেই গবেষণা করে কাটান।

১৯১১ সালের ১লা মার্চ ভ্যাণ্টহফের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে।

—
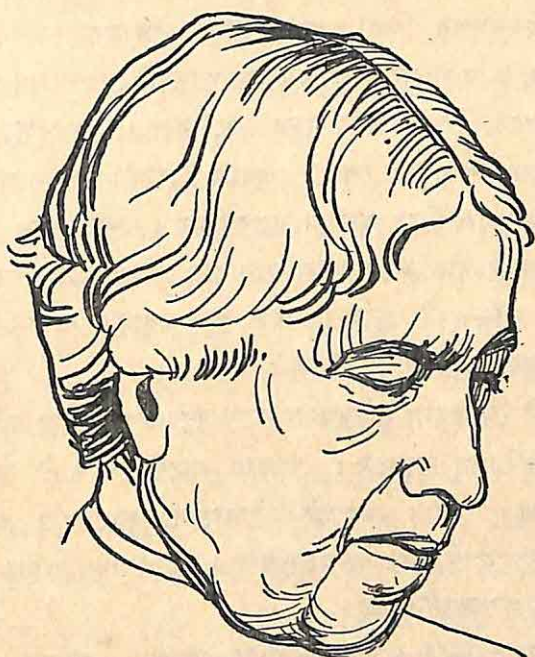
জগদীশচন্দ্র বসু

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৫৮—১৯৩৭)

১৮৫৮ সাল।

ভগবানচন্দ্র বসু তখন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় 'রাড়িখাল' একটি ছোট গ্রাম। সেই গ্রামেই তাঁর বাড়ী।

১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর। ভগবানচন্দ্রের একটি ছেলে হলো। ফুটফুটে ছোট্ট ছেলে। বাপ-মা আদর করে ছেলের নাম রাখলেন জগদীশচন্দ্র।

তখনকার দিনের উচ্চশিক্ষিত লোকেরা একটু বেশী ইংরেজী ঘেঁষা ছিলেন। বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে ইংরেজদের অনুকরণ করা ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। তাই তাঁরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে

পাঠাতেন ইংরেজী বিদ্যালয়ে। কিন্তু ভগবানচন্দ্র ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। তাই জগদীশের শিক্ষা শুরু হয় বাংলা বিদ্যালয়ে। গরীবের ছেলেরা পড়ে সেখানে, আর পড়ানো হয় বাংলার পাড়াগাঁয়ের সম্পূর্ণ দেশী কায়দায়।

দেখতে দেখতে ক'টা বছর কেটে যায়। ফরিদপুরের বাংলা বিদ্যালয়ে জগদীশের শিক্ষা হয় শেষ। এবার ইংরাজী শেখার পালা। ভগবানচন্দ্র তাই ছেলেকে নিয়ে আসেন কলকাতায়। ভর্তি করে দেন 'হেয়ার স্কুলে'। কিছুকাল হেয়ার স্কুলে পড়ানোর পর ভগবানচন্দ্র ছেলেকে ভর্তি করেন 'সেন্ট জেভিয়ার্স' স্কুলে। এই স্কুল থেকেই জগদীশচন্দ্র ১৮৭৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে পাশ করে জগদীশচন্দ্র ভর্তি হন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ফাদার লাফোঁ তখন ঐ কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর কাছেই বিজ্ঞানের হাতেখড়ি হয় জগদীশচন্দ্রের। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। চার বছর পড়ার পর বিজ্ঞানে বি এ পাশ করেন জগদীশচন্দ্র।

বাপের ইচ্ছা—ছেলে ডাক্তার হোক। এদিকে ছেলে চান জজ্ বা ম্যাজিষ্ট্রেট হতে। শেষে বাপের ইচ্ছানুযায়ী বিলেতে গিয়ে ডাক্তারী পড়াই স্থির হলো। এক শুভদিনে বাপ-মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে জগদীশচন্দ্র বিলেত রওনা হলেন। কিন্তু জাহাজে উঠেই জ্বরে কাবু হয়ে পড়লেন। ডাক্তার বললেনঃ কালাজ্বর। যাই হোক্, জাহাজেই চিকিৎসা চলতে লাগলো। কোনও মতে তিনি ইংলণ্ডে পৌছুলেন।

ইংলণ্ডে পৌঁছেই জগদীশচন্দ্র ভর্তি হলেন সেখানকার মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়তে। তখনও কিন্তু পুরনো জ্বর তাঁকে মাঝে মাঝে কষ্ট দেয়। অসুস্থ শরীর নিয়ে বেশী খাটতে পারেন না। শেষে মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠে অধ্যাপকদের পরামর্শে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে দিলেন জগদীশচন্দ্র। একটু সুস্থ হয়ে ১৮৮১ সালে বিজ্ঞান পড়তে ভর্তি হলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কেম্ব্রিজের 'ক্রাইষ্ট' কলেজ। এখানে পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যা তাঁর পাঠ্য বিষয়। কিন্তু শরীর ভাল থাকে না। এখনও মাঝে মাঝে জ্বর হয়। শেষে রোজ নিয়মিতভাবে ক' ঘণ্টা নৌকায় দাঁড়টানা অভ্যাস করেন জগদীশচন্দ্র। ব্যায়ামের ফলে তাঁর পুরনো রোগ

সেরে যায়। স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে ভাল হতে থাকে। শেষে ১৮৮৪ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি 'ট্রাইপোস' পাশ করেন। কিছুকাল পরে লণ্ডনের বি এস-সি ডিগ্রী লাভ করে দেশে ফিরে আসেন জগদীশচন্দ্র।

দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাও চালাতে থাকেন। বিদ্যুৎ এবং ঈথার তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি অনেক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। বিলেতের বিভিন্ন পত্রিকায় ঐসব তত্ত্ব সংক্রান্ত প্রবন্ধ লিখে পাঠান। প্রকাশিত হয় সেসব প্রবন্ধ। সেখানকার বিজ্ঞানীরা মুগ্ধ হয়ে যান এক অখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানীর পাণ্ডিত্যে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় জগদীশচন্দ্রকে 'ডক্টর অফ সায়েন্স' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই সময় বিনা তারে শব্দ পাঠাবার এক কল্পনা জাগে বিজ্ঞানীর মনে। চলে গবেষণা। অজ্ঞাত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। সে তত্ত্বের নাম বেতার তত্ত্ব। তারই ওপর ভিত্তি করে তিনি তৈরি করেন একটি বেতার যন্ত্র। সেই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এক মাইল দূরে তাঁর বাড়ীতে বিনা তারে সাংকেতিক শব্দ পাঠান। বাংলার তৎকালীন লাট সাহেবের সামনে পরীক্ষা হয়। লাটসাহেব অবাক হয়ে যান বাঙ্গালী বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব দেখে।

বিলেতের বহু কোটিপতি ব্যবসায়ী জগদীশচন্দ্রের কাছে ছুটে আসেন। 'বেতার তত্ত্ব' নিজের নামে পেটেণ্ট করার অনুরোধ জানান জগদীশচন্দ্রকে। নির্লোভ পুরুষ জগদীশচন্দ্র সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন: সাধনার ফলকে টাকা রোজগারের উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে আমি রাজী নই।

ঐ সময় ইটালীতে 'মার্কনি' নামে এক বিজ্ঞানী বিনা তারে সংবাদ পাঠাবার তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁর গবেষণাও সফল হয়। তিনি 'বেতার যন্ত্র' নিজের নামে পেটেণ্ট করান। বেতার যন্ত্র আবিষ্কারের গৌরব তিনিই লাভ করেন। সেই সঙ্গে দেশজোড়া খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ আসে তাঁর ঘরে।

এরপর জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যা ছেড়ে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। তিনি দেখাতে চান উদ্ভিদ আর মানবজীবন একই নিয়মে চলে। মানুষের মত উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। মানুষের মতই উদ্ভিদ

খায়-দায়, ঘুমোয়, সুখদুঃখ অনুভব করে, বৃদ্ধি পায়, আঘাতে ও উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

শুধু তত্ত্বই নয়। তত্ত্বকে প্রমাণ করার জন্য তিনি আবিষ্কার করলেন নতুন নতুন যন্ত্র। কোন যন্ত্রে মাপা যায় উদ্ভিদের স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া, আবার কোন যন্ত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়—উদ্ভিদ কিভাবে উত্তেজনায় সাড়া দেয়। এইসব যন্ত্রপাতি তৈরি হলে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে বিদেশে পাঠান। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্রপাতিগুলির সাহায্যে তাঁর আবিষ্কৃত প্রতিটি তত্ত্বের সত্যতা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করে দেন। প্রমাণ হয়—উদ্ভিদ জড় পদার্থ নয়, মানুষের মত তারও প্রাণ আছে। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব ওঠে। বিশ্বের দরবার থেকে জয়মাল্য কণ্ঠে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন জগদীশচন্দ্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি এস-সি উপাধিতে ভূষিত করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে তাঁকে সি আই ই, সি এস আই, নাইট প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করা হয়।

১৯১৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়। তবুও সরকার তাঁকে ছাড়েন না। এমেরিটাস অধ্যাপকের পদে পুরো বেতন দিয়ে তাঁকে নিযুক্ত করে রাখেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আচার্য বসু ঐ পদেই কাজ করে যান।

বিলেতের রয়্যাল ইনস্টিট্যুট দেখে জগদীশচন্দ্রের বড় ভাল লেগেছিল। স্বদেশে অমন একটা বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। আর তখন থেকে সেই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহও শুরু করেছিলেন।

১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর বিজ্ঞানাচার্যের সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। ঐ দিন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। আচার্যদেব সেদিন ঘোষণা করেন: এখানে বহুচর্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হবে না। নিত্যনূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার এবং বিশ্বের দরবারে সেই তত্ত্ব প্রচারই হবে এই বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্দেশ্য। এখানে থাকবে না জাতিভেদ। সকল জাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরকাল উন্মুক্ত থাকবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু যে কেবলমাত্র খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ছিলেন তা নয়, সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। বাংলায় বৈজ্ঞানিক

প্রবন্ধ লিখতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রচনা সরস ও সাহিত্য-পদবাচ্য। বাইরে রুক্ষ ভাব প্রকাশ পেলেও মনটা ছিল তাঁর কোমল। নিজের দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অসীম।

১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁর চিতাভস্ম 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'-সংলগ্ন সার্বজনীন মন্দিরে সযত্নে সমাধিস্থ করা হয়।

—
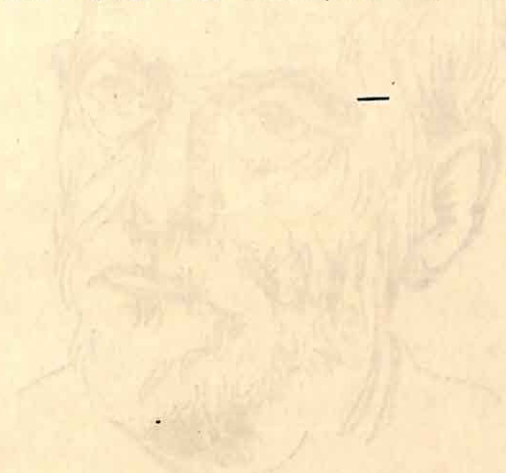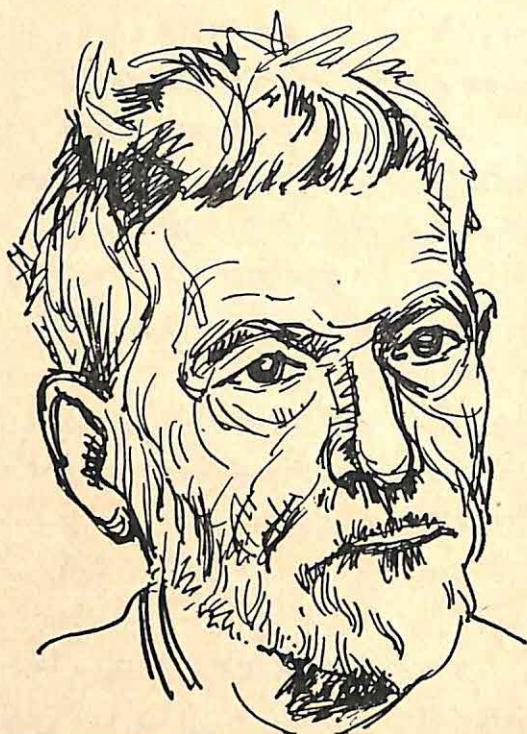
প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬১—১৯৪৪)

কলকাতার বিজ্ঞান কলেজের একটি ছোট্ট ঘর। ঘরে একটি ক্যাম্বিসের খাট, দু'একটি চেয়ার আর আলমারি। আলমারিগুলি বইয়ে ঠাসা। ক্যাম্বিসের খাটে শীর্ণ এক বৃদ্ধ শুয়ে বই পড়ছেন। মাথার চুল এলোমেলো-ভাবে ছড়ানো। শুভ্র গোঁফদাড়িতে মুখ ভরা। বৃদ্ধের পরনে খদ্দরের একটি ছোট ধুতি—হাঁটুর উপর তোলা। গায়ে একটি ছেঁড়া গেঞ্জি।

বিজ্ঞান কলেজের ঐ ঘরের সামনে এক সাহেব এসে দাঁড়ালেন। দরজার গোড়ায় নেই তক্‌মা পরা দরওয়ান, দরজায় আঁটা নেই নেম-প্লেট। সাহেব ঘরের মধ্যে এক বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে বললেন : আমি ডক্টর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই। উত্তরে বৃদ্ধ বললেন : আমিই ডক্টর রায়। বলুন

আপনার কি প্রয়োজন।

সাহেব তো অবাক! অত বড় যে বৈজ্ঞানিক, জগৎজোড়া যাঁর নামডাক, তাঁর কিনা এই বেশ! এমন সহজ জীবনযাত্রা পদ্ধতি! হ্যাঁ, অমন সহজ ও সরল জীবন যাপন করতেন আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক— আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল হরিশচন্দ্র রায় ও মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। সমাজ সেবায়, শিক্ষা বিস্তারে, পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় হরিশচন্দ্র ছিলেন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। পিতার উদার মনোভাব, জনসেবা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক সদ্‌গুণ প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল।

চার বছর বয়সে প্রফুল্লচন্দ্রের 'হাতেখড়ি' হয় এবং গ্রামের গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় তিনি বিদ্যারম্ভ করেন। ১৮৭৯ সালে কলকাতার অ্যালবার্ট স্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করেন। তারপর ভর্তি হন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন কলেজের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের) এফ এ ক্লাশে।

সে যুগে এফ এ পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার পাঠও বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু মেট্রোপলিটান কলেজে তখনও এই দুটি বিষয় পড়াবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। তাই প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে গিয়ে রসায়নের অধ্যাপক পেড্‌লার সাহেবের বক্তৃতা শুনতেন এবং নিয়মিত পাঠ নিতেন। পেড্‌লার ছিলেন তখনকার দিনে রসায়ন শাস্ত্রের খ্যাতিমান অধ্যাপক। তাঁর পাঠ নেওয়ার ফলে রসায়ন বিদ্যার প্রতি প্রফুল্লচন্দ্রের অনুরাগ বাড়ে। তিনি কলেজের পাঠ্য রসায়নের বই তো পড়তেনই, উপরন্তু রসায়ন বিদ্যার অনেক বই লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করেও পড়তেন। শুধু তাই নয়, বাড়ীতে একটি ছোটখাটো ল্যাবরেটরী স্থাপন করে তিনি সেখানে রসায়নের নানারকম পরীক্ষা চালাতেন। যাই হোক, প্রফুল্লচন্দ্র যথাসময়ে এফ এ পাশ করে বি এ ক্লাশে ভর্তি হতে উদ্যোগী হন।

বি এ-তে প্রফুল্লচন্দ্র বি-কোর্স গ্রহণ করেন। বি-কোর্সে বিজ্ঞান পড়ানো হতো। বি এ পড়বার সময় তিনি ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন এবং গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে

থাকেন। বলা বাহুল্য, প্রফুল্লচন্দ্র ঐ বৃত্তি পান এবং ২১ বছর বয়সে বিলাত যান। সেখানে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এস-সি ক্লাশে ভর্তি হন। এখানেও রসায়নই তাঁর প্রিয় পাঠ্যবিষয় ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র সসম্মানে বি এস-সি পাশ করেন। তারপর তিনি অজৈব রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণা করতে থাকেন এবং ১৮৮৭ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস-সি ডিগ্রী ও 'হোপ পুরস্কার' লাভ করেন। হোপ পুরস্কার পাওয়ার পর সেখানে তিনি আর এক বছর থেকে গবেষণা করেন।

১৮৮৮ সাল। আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ। বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে দেশে ফিরলেন প্রফুল্লচন্দ্র। পকেটে পয়সা নেই। বাধ্য হয়ে জাহাজের এক কর্মচারীর কাছ থেকে ধার নিলেন আটটি টাকা। জামিন হিসাবে তাঁর জিনিসপত্র রেখে দিলেন জাহাজের কেবিনেই।

কলকাতা বন্দর। জাহাজ থেকে নেমে প্রফুল্লচন্দ্র সোজা চলে গেলেন এক বন্ধুর বাড়ী। বন্ধুর কাছ থেকে ধার করলেন একখানি ধুতি আর একখানি চাদর। বিদেশী পোশাক ছেড়ে পরলেন ঐ ধুতি-চাদর। কয়েকদিন কলকাতায় কাটিয়ে তিনি রওনা হলেন রাড়ুলি—তাঁর দেশের বাড়ী। বিলেত থেকে তাঁর ফেরবার খবর বাড়ীতে তিনি জানাননি। ভয় ছিল—বাড়ীর সকলে যদি কলকাতা পর্যন্ত এগিয়ে এসে অর্থের অপব্যয় করে বসেন। মিতব্যয়িতা এতই ভালবাসতেন প্রফুল্লচন্দ্র।

দেশী কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় প্রফুল্লচন্দ্র কখনও ব্যবহার করতেন না। বাবুয়ানার উপর তিনি ছিলেন হাড়ে হাড়ে চটা। অমিতব্যয়ী লোকদের তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তাই তাঁকে বলতে শোনা যেত—যে দেশের লোক পেট ভরে খেতে পায় না, সে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করা শুধু অপরাধ নয়, মহাপাপ।

মনীষী জোন্‌স যখনই তাঁর মাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন, তখনই তাঁর মা উত্তর দিতেন—Read and you will know, অর্থাৎ পড়লেই জানতে পারবে। জোন্‌সের মায়ের ঐ উত্তরটি প্রফুল্লচন্দ্রের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ছেলেবেলায় স্কুলের পাঠ্য বই পড়ে তাঁর মন ভরতো না। হাতের কাছে যে বই তিনি পেতেন, তাই পড়ে শেষ করতেন। ইতিহাস ও জীবনী ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্যবিষয়। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১২ বছর, তখন থেকেই ভোর রাতে উঠে আপন মনে বসে বই পড়তেন।

বইপড়া ছিল তাঁর নেশা। আর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর এ নেশা ছিল। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখে গেছেন : আমি আজীবন ছাত্র-ভাবেই আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন চলে গেছে তা বুঝতে পারিনি। আজ বার্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু'ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী করে কাটিয়ে দিই। দিন সার্থক হয়, জগতে যা কিছু সৎ চিন্তা, উৎকৃষ্ট ভাব আছে, যা কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষ হওয়ার প্রেরণা যোগায়, তার সবই পুস্তকে নিহিত। অধ্যয়ন আমার কাছে সাধনার মত, ধ্যানধারণার সমতুল্য।

একসঙ্গে অনেকে বসে পড়া তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, বাঙ্গালী ছাত্রদের প্রধান শত্রু—পড়বার সময় অনেকের একত্র অবস্থান। এরূপ করলে গল্প আসবেই—অন্ততঃ অতর্কিতভাবে আসবেই; আর বাঙ্গালীর প্রধান বিপদ আড্ডা।

দেশে ফিরে এসে এক বছর চাকরির জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রফুল্লচন্দ্রকে। ১৮৮৯ সালের প্রথমভাগে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করেন গবেষণাও। প্রথম জীবনে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল সর্ষের তেল ও ঘি। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ নিয়েও তিনি গবেষণা চালান। তবে গবেষণায় অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেন ১৮৯৫ সালে। ঐ বছর তিনি আবিষ্কার করেন এক নতুন যৌগিক পদার্থ—নাম তার 'মারকিউরাস নাইট্রাইট'। এই আবিষ্কারের ফলে সারা বিশ্বে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

বাঙ্গালী ছেলেরা পরীক্ষায় পাশ করে চাকরির খোঁজে ঘোরে—একটা চাকরি না পেলে জীবনটা যেন ব্যর্থ হয়ে গেল—এমনিই ভাব। চাকরির ওপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র। সবাই চাকরির চেষ্টা করলে দেশে বেকার সমস্যা বেড়ে যায়—এই ছিল তাঁর মত। তাই তিনি চাকরির আশা ছেড়ে ব্যবসা করতে উপদেশ দিতেন দেশের ছেলেদের। তিনি বলতেন : তোমরা অনেকে পরীক্ষায় ফার্স্ট হও, সেকেণ্ড হও—সেটা ভাল। কিন্তু আমাদের দেশের অপযশ, কারণ পাশের পর তোমরা হও নষ্টস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া-জীর্ণ, রুগ্ন, ক্লিষ্ট ও ক্ষীণদৃষ্টি। আর পাশ না করতে পারলেই তোমাদের মুখ হয় অন্ধকার। এ অবস্থায় থাকলে চলবে না। এ জীবনের পথ নয়, মৃত্যুর পথ।

আমাদের কি দুর্বলচিত্ত, চাকুরিপ্রিয়, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হতে হবে, দৃঢ় হতে হবে, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ হতে হবে। অন্নসমস্যার মীমাংসা করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসা ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই।

'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' আজ শুধু বাংলা কেন, সারা ভারতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠান। এত বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের একটি অক্ষয় কীর্তি। প্রথম অবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজে কুলির মত খাটতেন।

প্রফুল্লচন্দ্র পরিশ্রমের মর্যাদা বুঝতেন। তাই শ্রমবিমুখ ও চাকুরিপ্রিয় বাঙ্গালী যুবকদের উদ্দেশে তিনি দুঃখ করে বলতেন: আমাদের দেশের লোক শ্রমের মর্যাদা বোঝে না। কায়িক পরিশ্রম করলেই ছোটলোক হলো—এই ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে। যে বলে—আমি কুলিগিরি করবো, আমি তাকে ধন্যবাদ দিই। বসে খাব বা কারও কাঁধে চেপে খাব—এ বড় জঘন্য কথা। যে অলস, যে পরজীবী, তার বেঁচে থাকবার অর্থ নেই।

বাঙ্গালীর সময়জ্ঞান নেই—এ অপবাদ আছে অনেকদিন থেকেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর এই অপবাদ ঘোচাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি নির্দিষ্ট সময়ে বক্তৃতা-কক্ষে যেতেন। সভা-সমিতিতে যেতে হলে ঠিক সময়ে তিনি হাজির হতেন। তিনি নিজে ছিলেন সময়নিষ্ঠ, তাই ছাত্রদেরও উপদেশ দিতেন সময়নিষ্ঠ হতে। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও'—এ কথায় তিনি ছিলেন পূর্ণ বিশ্বাসী। তাই, যে কোন কাজ আগে নিজে করে তবে ছাত্রদের তা করতে উপদেশ দিতেন।

আদর্শ অধ্যাপক ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষাদান অর্থহীন হয় বলে তিনি মনে করতেন। রসায়নশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলতেন: যে শাস্ত্র কোন বস্তুর অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়ার রহস্যকে ব্যাখ্যা করে, তাই হচ্ছে রসায়নশাস্ত্র। কিন্তু সাধারণ শিক্ষকের মত এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকতেন না। হাতেনাতে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন ছাত্রদের। যতক্ষণ সব ছাত্র না বুঝতো ততক্ষণ ছাড়তেন না। ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গঠন করবার জন্য, জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর ছিল অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

১৯১৬ সালে প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে 'পালিত অধ্যাপকের' পদ গ্রহণ করেন। এখানে প্রায় ২০ বছর অধ্যাপনা করার পর ১৯৩৬ সালে ৭৫ বছর বয়সে তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করলেও বিজ্ঞান কলেজকে তিনি পরিত্যাগ করেননি। আমৃত্যু তিনি বিজ্ঞান কলেজেরই একখানি ছোট ঘরে বাস করে গেছেন। ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন সেই ঘরেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন চিরকুমার। ছাত্রছাত্রীরাই ছিল তাঁর ছেলেমেয়ে। ছেলেমেয়ের মতই তিনি তাদের ভালবাসতেন। তাদের যেমন আদর করতেন, ভুলত্রুটির জন্য আবার ভর্ৎসনাও করতেন। তিনি বলতেন: আমার ছাত্রছাত্রীরাই আমার কর্মজীবনের ধনদৌলত। গরীব ছাত্রদের তিনি অর্থ দিয়ে, উপদেশ দিয়ে—নানাভাবে সাহায্য করতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই তাঁকে পিতার মত শ্রদ্ধা করতো, গুরুর মত ভক্তি করতো। আজকের দিনে তাঁর মত ছাত্রবৎসল আদর্শ অধ্যাপক সত্যিই বিরল।

সারাজীবন সহজ ও সরলভাবে জীবনযাপন করে শেষ বয়সে প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই সৎকাজে দান করে গেছেন। দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দু' দফায় ৭০ হাজার টাকা এবং খদ্দর প্রচার সমিতিকে ৫৬০০০ টাকা দান করে যান। খদ্দরকে উপলক্ষ করে দেশবাসী নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাই তিনি খাদির প্রসারের জন্য অত টাকা দান করে গেছেন। এ ছাড়া আরও অনেক সৎগুণের অধিকারী ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাই দেশবাসী তাঁকে চিরকাল সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে।

—
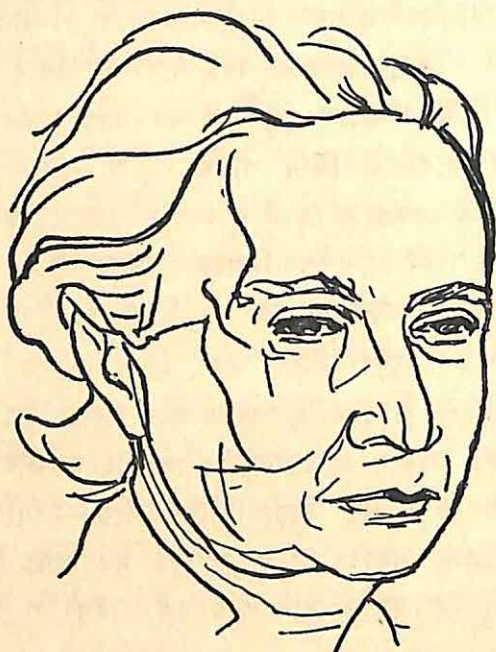
মাদাম ক্যুরী

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬৭—১৯৩৪)

প্যারি শহরের বুকে সন্ধ্যা নেমেছে।

প্রশস্ত রাজপথগুলি আলোয় ঝলমল করছে।

সেদিন কাতারে কাতারে লোক চলেছে ঐ রাজপথ দিয়ে। কি ব্যাপার? এত লোক চলেছে কোথায়?—চলেছে এক সভাগৃহে। ঐ সভাগৃহে আজ একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের গল্প বলবেন—দেখাবেন তাঁর আবিষ্কৃত সেই আশ্চর্য পদার্থটি। যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেবেন, তিনি পুরুষ নন—নারী। তাই লোকের কৌতূহলটা আজ বোধহয় আরও বেশী।

যাই হোক, সভাস্থলে উপস্থিত সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বক্তার জন্য অপেক্ষা করছেন। এমন সময় সৌম্যমূর্তি এক তরুণী সভাগৃহে প্রবেশ

করলেন—সঙ্গে তাঁর স্বামীও। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সসম্মানে ওঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

কিন্তু কে এই মহিলা?

—ইনি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাদাম ক্যুরী। আর ওঁর স্বামীর নাম পিয়ের ক্যুরী। তিনিও একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

ওঁরা দু'জন সভামঞ্চে বসলেন। সামনের টেবিলে রাখলেন সীসার একটি ছোট বাক্স। সভাগৃহের সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। এইবার বক্তৃতা শুরু হবে।

মাদাম ক্যুরী সীসার বাক্সটির ভেতর থেকে একটি কাচপাত্র বের করলেন। আর অমনি সভামঞ্চ মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

এ যে একেবারে ভৌতিক কাণ্ড!

মহিলা কি তাহলে যাদু জানেন?

না, তা নয়।

ঐ কাচপাত্রের মধ্যে ছিল সেই অত্যাশ্চর্য বস্তুটি, যা মাদাম ক্যুরী আবিষ্কার করেছিলেন। বস্তুটির নাম 'রেডিয়াম'। আর আলোক বিকিরণ করা রেডিয়ামের ধর্ম।

এরপর মাদাম ক্যুরী তাঁর রেডিয়াম আবিষ্কারের কাহিনী বলে চললেন। রেডিয়ামের ধর্মগুলির উল্লেখ করলেন। সবশেষে এও জানালেন যে, রেডিয়াম এক অফুরন্ত সম্ভাবনাময় পদার্থ। এর আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-জগতে আরও নতুন নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারের পথ উন্মুক্ত হবে।

অবাক বিস্ময়ে শ্রোতারা এই মহিলা বৈজ্ঞানিকের কথা শুনলেন। মুগ্ধ হলেন তাঁর মৌলিক আবিষ্কারের পরিচয় পেয়ে। পারস্যের সম্রাট এই আবিষ্কারের পরিচয় পেয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে, বক্তৃতা শেষে তিনি তাঁর রাজবেশ খুলে মাদাম ক্যুরীকে পরিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। তখন মাদাম ক্যুরী কি বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন: আমি বিজ্ঞান-সাধিকা। সাধিকার আড়ম্বর করা সাজে না। রাজ-পরিচ্ছদে আমার কি হবে সম্রাট?

মাদাম ক্যুরীর আসল নাম মেরী সক্লোদভস্কা। ১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে পোল্যাণ্ডের 'ওয়ারশ' শহরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। মাও ছিলেন শিক্ষিতা। ওঁরা ছিলেন

পোল্যাণ্ডের নাগরিক।

বাপ-মায়ের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন মেরী। সক্লোদভস্কা পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তার ওপর মেরীর বয়স যখন সাত বছর, তখন তাঁর মা মারা যান। ফলে ছেলেবেলাটা তাঁর খুবই কষ্টের মধ্যে কাটে। সংসারে অভাব-অনটন-দুঃখ-কষ্টের মাঝেও মেরী মন দিয়ে লেখাপড়া করতেন। শুধু তাই নয়—লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর বাবার স্কুলের ল্যাবরেটরীতে যেতেন এবং মনোযোগের সঙ্গে বিজ্ঞান অনুশীলন করতেন। এমনিভাবে বিজ্ঞানের প্রতি মেরীর অনুরাগ বাড়তে থাকে এবং অল্পবয়সেই বিজ্ঞানে তিনি বেশ জ্ঞানলাভ করেন।

যখনকার কথা বলছি, তখন পোল্যাণ্ড ছিল রাশিয়ার অধীন। ঐ সময় কোন কারণে মেরীর বাবা রাশিয়ার তৎকালীন সম্রাটের বিরাগভাজন হন। ফলে তাঁদের বাধ্য হয়ে চলে আসতে হয় ফরাসী দেশের রাজধানী 'প্যারি' শহরে।

এখানে এসে মেরী ঠিক করলেন যে, সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করবেন। কিন্তু টাকা কোথায়? অল্প কিছু টাকা কোনমতে যোগাড় করে তিনি ভর্তি হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুরু করলেন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানান্বেষণের সাধনা।

প্যারি শহরেই থাকতেন মেরীর বড় বোন ও ভগ্নীপতি। কিন্তু তাঁদের বাসায় থেকে পড়াশুনা করার অসুবিধা অনেক। মেরী তাই চলে এলেন প্যারির ল্যাটিন পাড়ায়। সেইখানে একটি ছোট কামরা ভাড়া নিলেন। ঐ ঘরটিই ছিল একাধারে তাঁর থাকবার, রান্নার, খাবার এবং লেখাপড়া করবার ঘর। সব কাজ তিনি নিজে হাতে করতেন, নইলে খরচ বাড়ে। অর্থাভাবে তাঁর ভাগ্যে ভাল খাবার জুটতো না। স্বল্পাহারে ও কঠোর পরিশ্রমে তাই তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন। একদিন তো ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে করতে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। সহপাঠীরা তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে আসে। খবর দেয় বড় বোন ব্রুনিয়া ও তাঁর স্বামীকে। তাঁরা এসে মেরীকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যান এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের কাছেই রাখেন।

এমনিভাবে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করেও মেরী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। ১৮৯৩ সালে পদার্থবিদ্যার ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রথম

হলেন। আর পরের বছর গণিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন। এই সময় পিয়ের ক্যুরী নামে পদার্থবিদ্যার এক তরুণ অধ্যাপকের সঙ্গে মেরীর পরিচয় হয় এবং মেরী ঐ অধ্যাপককে বিয়ে করেন। তখন থেকে মেরী হন 'মাদাম ক্যুরী'।

ইতিমধ্যে 'এক্স্-রে' বা রন্‌জেন্ রশ্মি আবিষ্কৃত হয়। এই রশ্মির আবিষ্কারে বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে হৈ চৈ পড়ে যায়। এর চেয়ে আরও তীব্র তেজসম্পন্ন কোন রশ্মি পাওয়া যায় কিনা তাই নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করে দেন। ফরাসী বৈজ্ঞানিক 'হেনরী বেকেরেল' পিচব্লেণ্ড নামক একরকম খনিজ পদার্থ থেকে আবিষ্কার করেন ইউরেনিয়াম যৌগ। এর তেজস্ক্রিয় গুণ আছে, আছে আলো দেওয়ার শক্তিও।

বেকেরেলের এই আবিষ্কার ক্যুরী দম্পত্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁরা অনুমান করেন যে, পিচব্লেণ্ডে ইউরেনিয়াম ছাড়া অধিক শক্তিশালী কোনও পদার্থ হয়তো থাকতে পারে। সেই অনুমানের ওপর নির্ভর করে তাঁরা গবেষণা শুরু করেন, হাঙ্গেরী থেকে স্বল্পমূল্যে আনানো হয় ইউরেনিয়ামবর্জিত পিচব্লেণ্ড। খোলা জায়গায় একটি চালাঘরে কয়েক টন ঐ খনিজ পদার্থ রাখা হয়। বড় বড় কটাহে অ্যাসিড ও জলে ঐ খনিজ পদার্থকে সেদ্ধ করা হতে থাকে। চালাঘরখানি ভরে যায় অ্যাসিডের বাষ্প ও ধোঁয়ায়। ক্যুরী দম্পতি সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে ভয় করতেন না। অজানার সন্ধানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটিয়ে দিতেন ঐখানেই। কখনও কখনও মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ওঁরা খাটতেন।

ওঁদের এ গবেষণার পথে বাধা অনেক। পিচব্লেণ্ড না হলে গবেষণা অচল, অথচ এ জিনিসটার দাম অনেক। কিনবার অত টাকা নেই। ক্যুরী দম্পত্তি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন ভিয়েনার বিজ্ঞান পরিষদ। বিজ্ঞান পরিষদ ওঁদের কয়েক টন টাটকা পিচব্লেণ্ড উপহার দিলেন। ওঁরা তখন নিশ্চিন্তে গবেষণা করতে লাগলেন।

গবেষণায় প্রাথমিক সাফল্য এল কয়েক বছরের মধ্যেই। ১৮৯৮ সালে পিচব্লেণ্ড থেকে প্রথমে এক তেজস্ক্রিয় আদি বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল। মাতৃভূমি পোল্যাণ্ডের নামানুসারে মাদাম ক্যুরী সেই বস্তুর নাম দিলেন 'পোলোনিয়াম'। পোলোনিয়াম কিন্তু তাঁর ঈপ্সিত বস্তু নয়। তাই আবার চললো অক্লান্ত গবেষণা। অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পিচব্লেণ্ড

থেকে তাঁরা ক্ষারধর্মী এক নতুন মৌলিক পদার্থ নিষ্কাশন করতে সক্ষম হলেন। ঐ মৌলিক পদার্থই 'রেডিয়াম'। এর তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার চেয়ে দশ লক্ষ গুণ প্রবল। রেডিয়াম আবিষ্কার বিজ্ঞান জগতে এক নব যুগের সূচনা করলো। সারা বিশ্বে মাদাম ক্যুরীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদাম ক্যুরী ও তাঁর স্বামী যুগ্মভাবে পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। ১৯১১ সালে মাদাম ক্যুরী আবার নোবেল পুরস্কার পেলেন। এবারের পুরস্কারটি রসায়ন বিদ্যায় এবং তা বিশুদ্ধ রেডিয়াম প্রস্তুত ও তার পারমাণবিক ওজন নির্ণয়ের জন্য। বিজ্ঞানের ইতিহাসে একই ব্যক্তির দু'বার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল।

১৯০৬ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে অধ্যাপক পিয়ের ক্যুরী এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। মাদাম ক্যুরী শোকে ভেঙ্গে পড়লেন কিন্তু আদর্শভ্রষ্ট হলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীর পদে তিনি অধ্যাপনা করতে লাগলেন। শেষ বয়সে চোখে ছানি পড়ে দৃষ্টিশক্তি কমে গেল। তবুও বিজ্ঞান সাধনায় তিনি হার মানলেন না। চোখে পুরু কাচের চশমা লাগিয়ে এবং হাতে লেন্স নিয়ে গবেষণাগারে বসে কাজ চালাতে লাগলেন।

১৯১২ সালে ফরাসী সরকার 'ক্যুরী ইনস্টিটিউট অফ রেডিয়াম' নামে একটি গবেষণাগার স্থাপন করলেন। মাদাম ক্যুরী হলেন সেখানকার সর্বময় কর্ত্রী। দুরন্ত ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় রেডিয়াম খুবই কার্যকর বলে প্রতিপন্ন হলো। কিন্তু এদিকে রেডিয়ামের অদৃশ্য রশ্মির তেজে অল্পে অল্পে মাদাম ক্যুরীর জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়ে গেল। শেষে ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। পৃথিবী হারালো এক প্রতিভাময়ী বিজ্ঞান-সাধিকাকে।

—
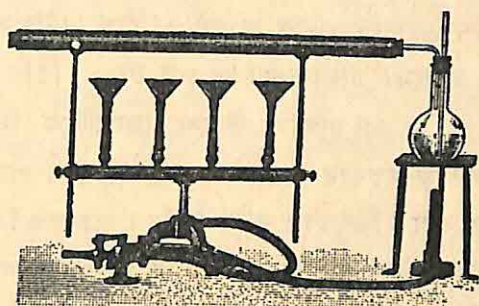
লর্ড রাদারফোর্ড

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭১—১৯৩৭)

১৯৩৭ সাল।

ইংলণ্ডে সে বছর একখানি বিচিত্র বই প্রকাশিত হয়। বইখানির নাম 'দি নিউয়ার অ্যালকেমি'।—না, মধ্যযুগের কোন অ্যালকেমিষ্ট-এর লেখা কোন বইয়ের অনুবাদ এটা নয়। এটা লেখা পৃথিবীর একজন সেরা বিজ্ঞানীর। নাম তাঁর 'লর্ড আরনেষ্ট রাদারফোর্ড।'

অ্যালকেমিষ্টরা লোহা, সীসা এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট ধাতুকে সোনায় পরিণত করার জন্য নিরলস সাধনা করে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা কোনদিনই সফল হয়নি। লর্ড রাদারফোর্ড অবশ্য অ্যালকেমিষ্টদের মত কোন ধাতুকে সোনায় পরিণত করার চেষ্টা করেননি। তিনি করেছিলেন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। আর সেই সব পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, 'প্রকৃতিই সেরা অ্যালকেমিষ্ট'। সৃষ্টির আদি থেকেই ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম যৌগগুলি অবিরত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কয়েক প্রকার অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণ করে যাচ্ছে, আর তার ফলে ঐ পদার্থগুলি আপনাআপনি নতুন দুটি মৌল—রেডিয়াম ও পোলোনিয়াম-এ পরিবর্তিত হচ্ছে। এই তেজস্ক্রিয় মৌলগুলিও আবার ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে পরিণত হচ্ছে ধাতব সীসায়

(সোনায় নয়)। মৌলিক পদার্থের এই রূপান্তরের কথাই রাদারফোর্ড বর্ণনা করেছিলেন 'দি নিউয়ার অ্যালকেমি' বইটিতে।

১৮৭১ সালের ৩০শে আগষ্ট তারিখে নিউজিল্যাণ্ডের অন্তর্গত 'নেলসন' শহরে আরনেষ্ট রাদারফোর্ডের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন এক স্কচ দম্পতির সন্তান। ঐ স্কচ দম্পতি তাঁদের ছেলেটিকে উচ্চশিক্ষিত করে তোলার জন্য অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তাই ছেলের পড়াশুনার জন্য তাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। ছেলেও ছিলেন মেধাবী। কি স্কুল, কি কলেজ—সর্বত্রই তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা—সকল বিষয়েই তিনি অসামান্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ছাত্রজীবনে অজস্র বৃত্তি ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ১৮৮৯ সালে নেলসন কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে তিনি নিউজিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবার জন্য একটি বৃত্তি লাভ করেন। এইখানে পড়াশুনা করার সময় রাদারফোর্ড পদার্থবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। সাফল্যের সঙ্গে এখানকার পাঠ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই রাদারফোর্ড কেম্বি্‌জের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করার জন্য একটি বৃত্তি লাভ করেন এবং স্যার জে, জে, টমসনের অধীনে গবেষণা করতে থাকেন। এখানে তিনি প্রথমে একটি 'চৌম্বক ডিটেক্টার' যন্ত্র নির্মাণে সক্ষম হন। যদিও যন্ত্রটি সর্বাঙ্গসুন্দর বা নিখুঁত হয়নি, তবুও সেটি বৈজ্ঞানিক মার্কনিকে বেতার যন্ত্র নির্মাণে প্রেরণা যুগিয়েছিল। এরপর রাদারফোর্ড তাঁর গুরু জে, জে, টমসনের অধীনে থেকে গ্যাসের ওপর এক্স-রশ্মির প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করতে থাকেন এবং তার ফলে ১৮৯৭ সালে টমসন পদার্থের বৈদ্যুতিক প্রকৃতি নির্ধারণে সক্ষম হন।

এই সময়ে মাত্র দু'বছরের মধ্যে রন্টগেন, বেকেরেল, টমসন ও মাদাম ক্যুরীর গবেষণার ফলে তেজস্ক্রিয় মৌল আবিষ্কৃত হয় ও তা নিষ্কাশন করাও সম্ভব হয়। ১৮৯৮ সালে রাদারফোর্ড মনট্রিলের ম্যাক্‌গিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং সেইখানেই তিনি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়ামের বিকিরণ সম্পর্কে গবেষণা করতে থাকেন। গবেষণায় সাফল্য আসে কিছুকালের মধ্যেই এবং রাদারফোর্ড তখন ঘোষণা করেন যে, ইউরেনিয়াম নামক তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু থেকে

দু'রকমের রশ্মি নির্গত হয়। তাদের নাম যথাক্রমে আলফা ও বিটা রশ্মি। রাদারফোর্ড এই রশ্মি দুটি আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি এদের ধর্ম ও প্রকৃতি নির্ধারণেও সক্ষম হন। ১৯০২ সালে রাদারফোর্ড সোডির সঙ্গে একযোগে কাজ করে তেজস্ক্রিয় পরিবর্তনের নীতি নির্ণয় করেন। তাঁরা বলেন যে, তেজস্ক্রিয়তা হলো পরমাণুর ধর্ম। পদার্থের ভৌত পরিবেশ অথবা রাসায়নিক গঠনের ওপর তেজস্ক্রিয়তা ধর্ম নির্ভর করে না।

১৯০৭ সালে রাদারফোর্ড ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের গবেষণাগারের ডাইরেক্টার পদে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি আলফা বিকিরণ সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন।

আলফা রশ্মি সম্পর্কে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯০৮ সালে রসায়নবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অধ্যাপক গাইগার-এর সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি 'গাইগার কাউন্টার' আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে আলফা কণার সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। আবার তাঁরা যুগ্মভাবে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, পরমাণুতে 'নিউক্লিয়াস' থাকে এবং সেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকে পদার্থের ভর ও ধনাত্মক আধান।

১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি দ্বি-পরমাণুক গ্যাসীয় মৌলের অণুকে যদি আলফা কণার দ্বারা আঘাত করা যায় তাহলে 'প্রোটন' নামক প্রাথমিক কণার উৎপত্তি হয়। তিনি আলফা কণাগুলি দ্বারা নাইট্রোজেনের নিউক্লিয়াসে আঘাত করে দেখান যে, নিউক্লিয়াস থেকে কেবল অন্যান্য আলফা কণাই বিস্থাপিত হয় না, বরং সেই সঙ্গে নাইট্রোজেনের নিউক্লিয়াস অক্সিজেনের নিউক্লিয়াসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের রূপান্তরের এইটিই প্রথম পদক্ষেপ। ১৯১৯ সালেই রাদারফোর্ড আবার কেম্ব্রিজে ফিরে যান এবং পদার্থের মৌলান্তরণ সম্পর্কে গবেষণা করতে থাকেন। ১৯৩২ সালে তিনি এবং তাঁর গবেষক-ছাত্র স্যাডউইক একযোগে ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগারে নিউট্রোন কণার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।

রাদারফোর্ড খুব সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। শিশুদের তিনি খুব

ভালবাসতেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেক বৈজ্ঞানিক তাঁর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে পড়তেন। ছাত্রদের বা সহযোগী গবেষকদের কাছ থেকে সুন্দরভাবে কাজ আদায় করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল রাদারফোর্ডের। সারা জীবনে রাদারফোর্ড অজস্র পুরস্কার ও সম্মান লাভ করেছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি 'নাইট' এবং ১৯২৫ সালে 'অর্ডার অফ মেরিট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে যে সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার আগেই ১৯৩৭ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন। ঐ সভায় তাঁর লিখিত ভাষণ পড়ে শোনান তাঁর স্থলাভিষিক্ত সভাপতি—প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক 'স্যার জেম্স্ জিন্স্'।

—
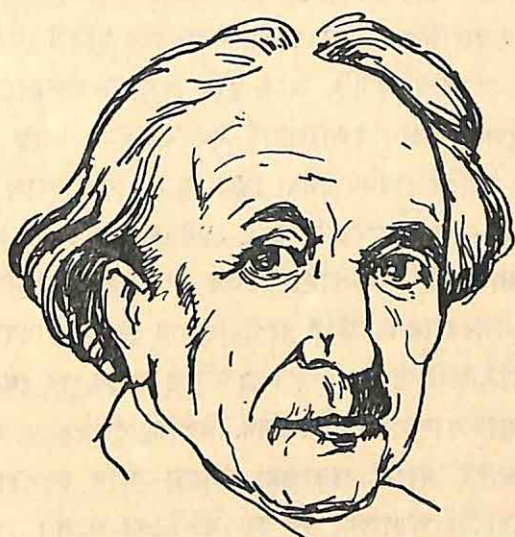
অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৭৯—১৯৫৫)

নিউইয়র্ক শহরে হাডসন নদীর তীরে 'রিভারসাইড গীর্জা'। গীর্জার প্রাচীর শ্বেতমর্মর দিয়ে তৈরি। সেই প্রাচীরের গায়ে সর্বদেশের সর্বকালের ছ'শো মনীষীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রয়েছে।

১৯৩০ সাল।

এক প্রৌঢ় দম্পতি এলেন সেই গীর্জায়।

ভদ্রলোকের মাথায় বড় বড় চুল। চুলগুলি এলোমেলো অবিন্যস্ত। ডাগর ডাগর দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। মুখে শিশুর সারল্য।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনায় ঘুরে ঘুরে দেখছেন--প্রাচীরের গায়ে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি। এক সময়ে ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর হাত ধরে একটি মূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন ঃ ঐ দেখ এলবারতল্, তোমার মূর্তি।

দুজ'নে এসে দাঁড়ালেন সেই মূর্তির কাছে। ভদ্রলোক সসঙ্কোচে তাকালেন সেই মূর্তিটির দিকে। কি যেন ভাবতে ভাবতে নিজের হাতের

আঙ্গুলগুলি ঢুকিয়ে দিলেন অবিন্যস্ত চুলের মাঝে। মূর্তিগুলি যেসব মনীষীদের—তাঁদের পাঁচশো নিরানব্বুই জনই মৃত। জীবিত শুধু একজন। হঠাৎ ভদ্রলোকের মনে হলো—পাথরের মূর্তিটি যেন মুচকি হেসে বলছে ঃ আমি তোমার কীর্তি আর তুমি আমার রক্তমাংসের শরীর! মূর্তিটির নীচে লেখা আছে "অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন। জন্ম ঃ ১৪ই মার্চ, ১৮৭৯।" মৃত্যুর তারিখ সেদিন লেখা ছিল না। কিন্তু আজ কেউ সেখানে গেলে দেখবেন—লেখা আছে "মৃত্যু ঃ ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৫ সাল।"

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের জন্ম হয়েছিল জার্মানীর 'উল্‌ম' শহরে এক ইহুদী পরিবারে। তাঁর বাবা ছিলেন ছোট কারবারী। নাম ছিল তাঁর হেরম্যান আইনষ্টাইন। ১৮৭৯ সালে জন্মের পর থেকেই অ্যালবার্ট দেশ-দেশান্তরে যাযাবর। মিউনিখ, মিলান, পাভিয়া ও আরও কত জায়গায়। তবু তারই মাঝে পড়াশুনা চলতো আর চলতো বেহালা বাজানো। অ্যালবার্টের পড়াশুনা শুরু হয় মিউনিখের স্কুলে। স্কুলে পড়াশুনায় তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। প্রশ্নবাণে মাষ্টারমশাইদের তিনি উত্ত্যক্ত করে তুলতেন।

ছাত্রজীবনে অ্যালবার্টের মেধার মূলে নাড়া দেয় একখানি বই। নাম তার 'ইউক্লিডের জ্যামিতি'। অধিকাংশ ছাত্রের কাছেই নীরস এই বইখানি অ্যালবার্টের অজ্ঞাত রসলোকের দ্বার খুলে দিল। বালক অ্যালবার্ট একে একে পড়ে শেষ করলেন ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, ডিফারেন্সিয়াল ক্যাল-কুলাস ও অ্যানালিটিকাল জিওমেট্রি। তবুও তাঁর মন ভরলো না। আরও নতুন নতুন গণিতের বই চাই।

জুরিখের পলিটেকনিক ইনস্টিট্যুট-এ পড়বার সময় আইনষ্টাইন কলেজের ল্যাবরেটরীতেই বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন। তিনি সরাসরি পরীক্ষার একটা মস্ত আকর্ষণ অনুভব করতেন। পদার্থ-বিজ্ঞানের যেসব সমস্যার কথা তাঁর মনে অল্পবয়সেই দেখা দিয়েছিল, তার উত্তর তিনি খুঁজতেন ঘরে বসে হেল্‌মহোল্‌ট্‌স, কিরকফ ও হার্টস্‌-এর বই পড়ে।

স্নাতক হবার পর ১৯০১ সালে আইনষ্টাইন বিয়ে করলেন এবং অনেক কষ্টে একটি চাকরি যোগাড় করলেন সুইস পেটেন্ট অফিসে। সামান্য কেরাণীর কাজ পেলেন। কিন্তু তারই মাঝে সৃষ্টির তাগিদে তিনি গবেষণা করে চললেন। তিনি বললেন ঃ আমি প্রতিদিন শতবার স্মরণ করি যে,

আমার মানসিক ও শারীরিক জীবন নির্ভর করছে জীবিত বা মৃত ব্যক্তিদের পরিশ্রমের উপর। আমি যে খাদ্য খেয়ে বেঁচে আছি, সে খাদ্য ফলাচ্ছে অন্যলোক। আমি যে পোষাক পরছি, সে পোষাক তৈরি করছে অন্য লোক। আমি যে গৃহে বাস করছি, সে গৃহ তৈরি করছে অন্য লোক। শৈশবকাল থেকে আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি, তা পেয়েছি অন্য লোকের কাছ থেকে। তাই যতটা পরিমাণে দান আমি পেয়েছি এবং এখনও পাচ্ছি—ততটা দান করবার চেষ্টা আমাকে করতে হবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আইনষ্টাইনের সুসজ্জিত আধুনিক গবেষণাগার ছিল না। এক টুকরো পেনসিল, কিছু কাগজ আর রাশি রাশি গাণিতিক সংখ্যা—এরই সমন্বয়ে তিনি তাত্ত্বিক ও ফলিত বিজ্ঞানে ঘটিয়েছেন বিপ্লব। মস্তিষ্ক ও মেধাই ছিল আইনষ্টাইনের গবেষণাগার। সেই গবেষণাগারের সাহায্যে দূরবীক্ষণে যতদূর দেখা যায়, তার চেয়েও অনেক দূর পর্যন্ত তিনি দেখতে পেতেন।

১৯০১ সালে আইনষ্টাইনের প্রথম মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় কৈশিক আকর্ষণ বিষয়ে। তারপর থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে অগণিত মৌলিক প্রবন্ধ—তাপ, গণিত ও আলোক-বিদ্যুত শাখাকে কেন্দ্র করে। আইনষ্টাইনের আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ—এই তিনটি দিয়েই যে কোন বস্তুর পরিমাপ সম্ভব। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধের মাপকাঠি তৈরি হয়েছে কোন নিত্য এবং স্থির বস্তুকে আদর্শ করে। কিন্তু আইনষ্টাইন বললেন—পৃথিবীতে স্থির বস্তু বলে কিছু নেই। গোটা বিশ্বজগৎটাই গতিশীল, যা কিছু আমরা মাপছি, তা গতির পরিপ্রেক্ষিতেই মাপছি। অর্থাৎ 'স্পেস' বা 'দেশ' নিত্যবস্তু নয়, সেটা সময়-নির্ভর। আবার সময়ও দেশ-নির্ভর, অর্থাৎ কোন নক্ষত্র থেকে মাপা পৃথিবীর দিন এবং পৃথিবী থেকে মাপা পৃথিবীর দিন কখনই সমান হবে না। এই যে গতি, সময় আর দেশের অবস্থিতির পারস্পরিক সম্পর্ক—এরই দুরূহ গাণিতিক বিশ্লেষণে গড়ে উঠেছে আইনষ্টাইনের বিখ্যাত 'স্পেস্-টাইম-ফাংশন'—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের প্রচলিত পরিমাপের সঙ্গে চতুর্থ পরিমাপ—সময়ের অবতারণা বা 'ফোর্থ-ডায়মেনশন।'

অঙ্ক কষে আইনষ্টাইন বলে দিলেন—যে কোন দেশে যে কোন বস্তু থাকলেই দেশের বক্রতা ঘটে এবং দেশে উৎপন্ন এই বক্রতার ফলে

আশপাশের অন্যান্য বস্তুর গতি তখন বক্রপথে ধাবিত হয়। পৃথিবীর উপস্থিতিতে দেশে (স্পেস) যে বক্রতার সৃষ্টি হয় তারই ফলে আপেল ফল মাটিতে পড়ে। নিউটন বলেছিলেন 'মাধ্যাকর্ষণ' পদার্থের স্বাভাবিক ধর্ম—আকর্ষণজাত। আইনষ্টাইন বললেন—আমরা আকর্ষণ যাকে বলি, সেটা বস্তুর ধর্ম নয়, ক্ষেত্রের ধর্ম। আবার দেশের এই বক্রতার জন্যই আলোকরশ্মিও সরল পথে না গিয়ে বক্রপথে চলে।—এটা আইনষ্টাইনের শুধু গাণিতিক সিদ্ধান্তই নয়, পরবর্তীকালের পরীক্ষায় এটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আইনষ্টাইন বলেছেন দেশ ও কালের মধ্যে গতিশীল বিশ্বে 'অ্যাবসল্যুট' কোন মাপই নেই। সবই একে অপরের আপেক্ষিক। নিত্যবস্তু কেবল আলো আর আলোর গতিবেগ। আলোর গতিবেগই চরম গতিবেগ। এই গতিবেগ পার হতে পারলে উল্টো কালে ফেরা সম্ভব, অর্থাৎ ইতিহাসের পশ্চাদগতি সম্ভব! আবার ভরও গতি-নির্ভর। বস্তুর গতি যত বাড়ে, ভরও তত বাড়ে। শেষ সীমা অর্থাৎ আলোর গতির সীমায় যখন গতি পৌঁছায়, তখন বস্তুর ভর হয় অসীম।

আইনষ্টাইনের আগে পর্যন্ত পদার্থ ও শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে ধারণা ছিল আইনষ্টাইন তার মূলে কুঠারাঘাত করলেন একটি মাত্র সূত্রের সাহায্যে। তিনি বললেন, পদার্থ আর শক্তি একই। একটার অপরটায় রূপান্তর সম্ভব। অঙ্ক কষে তিনি সূত্র বের করলেন $E = mc^2$, এখানে E হচ্ছে শক্তি, m হচ্ছে ভর এবং c হচ্ছে শূন্যে বা বায়ুমণ্ডলে আলোর গতিবেগ। এই সূত্র অনুসারে বলা যায় যে, এক গ্রাম ওজনের কোন বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করলে যে অপরিমিত শক্তির উদ্ভব হয় তা মানুষের কল্পনার বাইরে। এই সূত্রকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে পারমাণবিক বোমা।

১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের 'স্পেশ্যাল থিয়োরি'। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় আপেক্ষিকতা তত্ত্বের 'জেনারেলাইজ্‌ড্ থিয়োরি'। বিজ্ঞানী মহলে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই তত্ত্ব গণিত বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার মৌলিক ভিত্তিতে আমূল বিপ্লব ঘটায়। আইনষ্টাইনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। প্রাগ, জুরিখ, বার্লিন ও আরও অনেক

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনষ্টাইনের কাছে প্রস্তাব আসে অধ্যাপক পদ গ্রহণ করার।

হ্যাঁ, পেটেণ্ট আপিসের সামান্য করণিক আইনষ্টাইন অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি বার্লিনের বিখ্যাত কাইজার উইলহেল্‌ম ইনষ্টিট্যুটের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেছিলেন। পদার্থবিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯২১ সালে। হিটলারের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য জার্মানী থেকে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন ১৯৩৩ সালে। প্রথমে ফ্রান্স, তারপর বেলজিয়ামে ও পরে ইংল্যাণ্ডে। সবশেষে তিনি চলে এলেন আমেরিকায়। ১৯৪০ সালে তিনি আমেরিকার নাগরিক অধিকার পেলেন। সেখানকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে লাগলেন। শেষ জীবনে সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আচার্য পদে উন্নীত হলেন আইনষ্টাইন। আর ঐ পদে কাজ করেই বাকি জীবনটুকু তাঁর কেটে গেল।

বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হোক—ধ্বংসের কাজে নয়—এই ছিল আইনষ্টাইনের কামনা। পারমাণবিক বোমা ব্যবহার না করবার জন্য তিনি আমেরিকার সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর যখন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলো, তখন গভীর দুঃখের সঙ্গে আইনষ্টাইন বলেছিলেন : আবার যদি জন্মাতে হয় তো জন্মাতে চাই বিজ্ঞানী হয়ে নয়, জন্মাতে চাই কামার, কুমোর বা ছুতোর হয়ে—যাতে করে চিন্তার, বাক্যের ও কর্মের স্বাধীনতা থাকে—শান্তি থাকে কর্মে ও মনে।

আইনষ্টাইন ছিলেন শান্তিবাদী। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বলতেন : আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করি এইজন্য যে, সমসাময়িক এক মনীষী সত্যের প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের নমস্য। তাই প্রিন্সটনে আইনষ্টাইনের পড়ার টেবিলের সামনে থাকতো গান্ধীজীর একখানি ফটো।

লোভ, অর্থ, যশ বা উচ্চপদের প্রতি আইনষ্টাইনের কোনদিনই লোভ ছিল না। আর ছিল না অহঙ্কার। ১৯৫২ সালে ইজরায়েলের প্রথম প্রেসিডেণ্ট 'চেইম ওয়াইজম্যান' মারা গেলে পর শ্রেষ্ঠ ইহুদী হিসাবে

আইনষ্টাইনকেই ঐ পদটি গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। কিন্তু এই আমন্ত্রণ গ্রহণে অক্ষমতা জানিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, এই ভৌত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনা করতেই আমি ভালবাসি। মানুষ নিয়ে কাজ-কারবারের অভিজ্ঞতা অথবা ঐ বিষয়ে স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা আমার নেই। এমনই নির্লোভ পুরুষ ছিলেন আইনষ্টাইন।

দেশ বদলে যাবে, কাল বদলে যাবে, বদলে যাবে ব্যক্তিমানসও। বিস্মরণের আকাশে অনেক তারাই যাবে ম্লান হয়ে, কিন্তু একটি তারা রইবে চির ভাস্বর হয়ে। সেই তারাটি হলো বিজ্ঞান আকাশের ধ্রুবতারা—বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন।

—

স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮১—১৯৫৫)

পেনিসিলিন।

ছোট্ট একটি নাম। কিন্তু এ নাম বিশ্বের কারুরই আজ অজানা নয়। এই জীবাণুশাসক বা 'অ্যান্টিবায়োটিক'টিকে দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ মানুষের কাছে প্রথম পৌঁছে দেন যিনি—তাঁরই নাম স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

১৮৮১ সাল। ৬ই আগষ্ট।

এই দিনটিতে ডার্ভেলের অন্তর্গত 'লক্‌ফিল্ড' নামক স্থানে ফ্লেমিং-এর জন্ম হয়। জাতিতে ফ্লেমিং আয়ারসায়ার স্কচ—এক চাষীর সন্তান।

ডার্ভেলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফ্লেমিং-এর ছাত্রজীবন শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি চলে যান লণ্ডনে। ভর্তি হন সেখানকার এক পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে। সেখানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছু রোজগারও করতে থাকেন। কাজ তেমন কিছু নয়। শহরের এক অফিসে বয়-এর কাজ।

এই সময় ফ্লেমিং-পরিবারে আর্থিক বিপর্যয় ঘটে। ফলে হাইস্কুলের পাঠ শেষ করা মাত্রই ফ্লেমিং উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলেজে ভর্তি হতে পারেন না। তাঁকে এক জাহাজ কোম্পানিতে বাধ্য হয়ে কেরাণীর কাজ নিতে হয়। বয়েস তখন মাত্র ষোল বছর। চার বছর ওখানে তিনি কাজ করেন।

ঠিক এই সময় ১৯০১ সালে ভাগ্যক্রমে ফ্লেমিং কিছু সম্পত্তির মালিকানা লাভ করেন। সেই সম্পত্তির আয় তাঁর উচ্চ শিক্ষালাভের সহায়ক হয়। ফ্লেমিং ডাক্তারী পড়া শুরু করেন।

ছাত্র হিসাবে ফ্লেমিং ছিলেন অতুলনীয়। শুধু লেখাপড়াতেই তিনি ভাল ছিলেন না। ভাল ছিলেন রাইফেল ছোঁড়ায়, সাঁতার কাটায়, পোলো খেলায় এবং ছবি আঁকায়। একই মানুষের মধ্যে এতগুলি সৎগুণের সমন্বয় খুব কমই দেখা যায়।

১৯০৬ সাল।

ফ্লেমিং সসম্মানে ডাক্তারী পাশ করেন। অধ্যাপক 'অ্যাম্রথ রাইট' তাঁকে তখন জীবাণুবিদ্যায় গবেষণা চালাতে পরামর্শ দেন। ফ্লেমিং সেই পরামর্শ গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক রাইট টাইফয়েড রোগ-প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করে ইতিমধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি তখন সেণ্ট মেরীস্ হাসপাতালে টিকা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। ফ্লেমিং অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে ঐখানেই গবেষণা করতে শুরু করলেন। গবেষণার বিষয়—জীবাণুবিদ্যা।

বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই জেনেছিলেন যে, রক্তের শ্বেত কণিকা বা লিউ-কোসাইট্স্ হচ্ছে জীবাণু প্রতিষেধক উপাদান। রাইট ও ফ্লেমিং—এই লিউকোসাইট্স্‌দের শক্তি বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের ধারণা ছিল এই যে, লিউকোসাইট্স্‌দের শক্তিবৃদ্ধি করতে পারলে এরা আরও ভালভাবে জীবাণুদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারবে। পারবে—সংগ্রাম করে রোগজীবাণুদের ধ্বংস করতে। এইভাবে লিউকোসাইট্স্‌দের শক্তিবৃদ্ধি করে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজতর হবে।

অধ্যাপক রাইট ও ফ্লেমিং—এই বিষয়টি নিয়ে আট বছর ধরে গবেষণা করেও কোন ফল পেলেন না। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তখন ওঁরা দু'জনেই যোগ দিলেন সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগে।

সেখানে আহত সৈন্যদের চিকিৎসা করতেন ওঁরা। সেই সঙ্গে জীবাণু প্রতিরোধক নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন।

১৯২২ সাল।

ফ্লেমিং এক নতুন জিনিস আবিষ্কার করলেন। তাঁর আবিষ্কৃত জিনিসটি একটি এন্‌জাইম (রাসায়নিক দ্রব্য)। নাম তার 'লাইসোজাইম'। ফ্লেমিং দেখলেন যে, লাইসোজাইম আছে নাকের শ্লেষ্মায়, চোখের জলে ও মুখের লালায়। আর এই লাইসোজাইমের আছে জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতা।

১৯২৮ সাল।

ফ্লেমিং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সে-বছর জীবাণুবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হলেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে সেণ্ট মেরীস্ হাসপাতালে গবেষণাও চালাতে লাগলেন। খুঁজে বেড়াতে লাগলেন জীবাণুশাসক।

ফ্লেমিং একদিন তাঁর গবেষণাগারে পুঁজ উৎপাদনকারী স্ট্যাফাই-লোকক্কাস্ ব্যাকটিরিয়া কালচার করে পরীক্ষা করছিলেন। পরীক্ষা করবার সময় একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, কালচার পাত্রগুলির কোনও একটিতে সবুজ রঙের ছত্রাক জন্মেছে। তাই দেখে ফ্লেমিং ভাবলেন যে, হয়তো বা ঐ ছত্রাকের বীজ বাতাসে ভেসে এসে কালচার প্লেটের ওপর পড়েছে। যাই হোক—ফ্লেমিংয়ের পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল প্রবল। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ঐ ছত্রাকের চারপাশের স্ট্যাফাইলোকক্কাস্ ব্যাকটিরিয়াগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফ্লেমিং বহুবার একই পরীক্ষা করলেন।

প্রতিবার একই ফল পেলেন। ভাবতে লাগলেন ফ্লেমিং—ব্যাকটিরিয়া-গুলো অদৃশ্য হলো কি ভাবে ?

ঐ ছত্রাক কি তার দেহনিঃসৃত কোন পদার্থের সাহায্যে ব্যাকটিরিয়াদের ধ্বংস করেছে ?

—হ্যাঁ, তাই।

অনেক পরীক্ষার পর ফ্লেমিং এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছুলেন। তিনি দেখলেন—ঐ ছত্রাক হচ্ছে পেনিসিলিয়াম নোটেটাম শ্রেণীর। এরই দেহনিঃসৃত পদার্থ, স্ট্যাফাইলোকক্কাস্ শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়াগুলোকে ধ্বংস করে ফেলেছে।

এতদিন ধরে ফ্লেমিং যা খুঁজছিলেন—পরীক্ষা করতে গিয়ে আকস্মিক-ভাবেই তা পেয়ে গেলেন। তিনি পেনিসিলিয়াম নোটেটাম শ্রেণীর ছত্রাকের দেহনিঃসৃত জীবাণুশাসক পদার্থটির নাম দিলেন 'পেনিসিলিন'।

পেনিসিলিন আবিষ্কার—চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ১৯৪৫ সালে এই জীবাণুশাসকটি আবিষ্কারের জন্যই ফ্লেমিং পেলেন নোবেল পুরস্কার। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে। বহু পুরস্কার, বহু সম্মান তিনি লাভ করলেন। কিন্তু গর্বে দিশেহারা হয়ে পড়লেন না। স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গেই তাঁকে তখন বলতে শোনা গেল : পেনিসিলিন প্রস্তুত করেছেন প্রকৃতিদেবী—আমি নই। আমি প্রকৃতির সেই দানকে খুঁজে বের করেছি মাত্র।

—
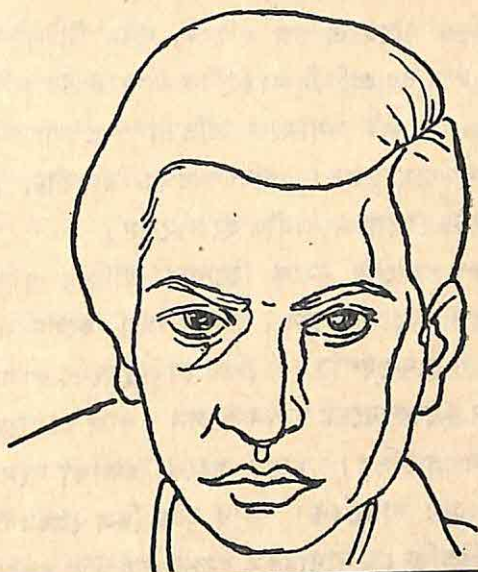
রামানুজন

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৭—১৯২০)

লণ্ডনের পুট্‌নে হাসপাতাল।

সেখানে এক তরুণ ভারতীয় গণিতবেত্তা সম্প্রতি চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত গণিত-বিজ্ঞানী অধ্যাপক হার্ডি একদিন ঐ হাসপাতালে তাঁকে দেখতে এসেছেন। অধ্যাপক হার্ডি যে গাড়ীতে চড়ে তাঁকে দেখতে এসেছেন, সে গাড়ীর নম্বর ১৭২৯। হার্ডি হঠাৎ রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন: ঐ সংখ্যাটির কোন বিশেষত্ব দেখতে পাচ্ছ কি? আমার তো মনে হয় সংখ্যাটির কোন বৈচিত্র্য নেই।

রোগশয্যায় শুয়েই তরুণ ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞানী উত্তর দিলেন: প্রফেসর হার্ডি, আপনার অনুমান ঠিক নয়। সংখ্যাটি খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। কারণ সংখ্যাটিকে ছ'ভাবে ছ'টি ত্রিঘাত যোগফলের সমষ্টিরূপে দেখানো যায়। তাছাড়া উক্ত সংখ্যারাজ্যে এই সংখ্যাটিই হচ্ছে তরুণতম।—এই বলে তিনি খাতায় লিখলেন $১৭২৯ = ১২^৩ + ১^৩ \quad ১০^৩ + ৭^৩$

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন অধ্যাপক হার্ডি। হার্ডি যখন অধ্যাপক লিট্‌ল্‌উডের কাছে এ গল্প করলেন, তখন লিট্‌ল্‌উড চমকে উঠে বললেন : আমার মনে হয় প্রতিটি স্বাভাবিক সংখ্যাই ওঁর অতি প্রিয় বন্ধু!

কিন্তু কে এই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন গণিত-বিজ্ঞানী?—ইনি হলেন শ্রীনিবাস রামানুজন। ইনিই প্রথম ভারতীয়, যিনি বিলাতের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো মনোনীত হয়েছিলেন।

১৮৮৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে মাদ্রাজের 'ইরোদ' গ্রামে রামানুজন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সামান্য কেরাণী। তাই দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে রামানুজনের বাল্যজীবন শুরু হয়। তিনি ভর্তি হন কুম্বকোনমের টাউন স্কুলে। স্কুলে রামানুজন ছিলেন শান্তশিষ্ট ও চিন্তাশীল প্রকৃতির। মাঝে মাঝে একাকী বসে তিনি নানান চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল যেমন প্রখর, তেমনি প্রখর ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। নানারকম অঙ্কের সূত্র তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

বাল্যকালেই রামানুজন গণিতবিদ্যার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন। মাত্র বারো বছর বয়সে তিনি লোনীর ত্রিকোণমিতি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে ফেলেন। ঐ বয়সেই তিনি সাইন-কোসাইন-এর উপর অয়লারের বিখ্যাত উপপাদ্যটি প্রমাণ করে সতীর্থদের তাক লাগিয়ে দেন। যখন তাঁর বয়স পনের বছর, তখন এক বন্ধুর কাছ থেকে তিনি একখানি অঙ্কের বই উপহার পান। বইখানির নাম "সিনপ্‌সিস্ অফ পিওর ম্যাথেমেটিক্স"। ঐ বই-খানিই রামানুজনের জীবনে এক নতুন আলোর সন্ধান এনে দেয়। এই বইখানি পড়েই তিনি গণিতের নানান জটিল সূত্র আবিষ্কার করেন। হাতের কাছে অন্য কোন বই না থাকায় রামানুজন তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতার বলে গণিতের নানান সূত্র মৌলিকতার সঙ্গে লিখতে থাকেন। নানা ধরনের চতুর্ভুজের সূত্র ঐ অল্প বয়সেই রামানুজন আবিষ্কার করে ফেলেন। সতীর্থরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন—কি ভাবে তিনি এইসব গাণিতিক সূত্র আবিষ্কার করেন? রামানুজন বলতেন : স্বপ্নে ঈশ্বর আমাকে বিভিন্ন সূত্রের মূলকথা-গুলি বলে দেন।

১৯০৩ সালে ষোল বছর বয়সে রামানুজন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংরাজী ও অঙ্কে পারদর্শিতার জন্য একটি বৃত্তিও পান।

কলেজে ঢুকে রামানুজন শুধু অঙ্ক নিয়েই মেতে রইলেন। অন্যান্য বিষয়, বিশেষ করে দর্শন ও ইংরাজীর প্রতি একেবারেই দৃষ্টি দিলেন না। ফলে ১৯০৭ সালে এফ এ পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হলেন। তাঁর বৃত্তি বন্ধ হয়ে গেল। কলেজে পড়াও বন্ধ হলো। দরিদ্র পিতা যে সামান্য অর্থ উপার্জন করেন, তাতে তাঁর পক্ষে সংসার চালানোই দুষ্কর। কাজেই তিনি ছেলেকে কলেজে পড়াবার ব্যয়ভার বহন করবেন কি ভাবে?

আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন রামানুজনকে এবার জীবিকার অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে হয়। চাকরির অন্বেষণ করেন, সেই সঙ্গে চালিয়ে যান গণিতচর্চা। গণিতচর্চা করে কত বিনিদ্র রজনী যে তিনি অতিবাহিত করেন তার ইয়ত্তা নেই। আর্থিক অসচ্ছলতা ও ছাত্রজীবনের ব্যর্থতা তাঁকে গণিতের গবেষণা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। পারেনি তাঁকে সংখ্যার খেলা থেকে নিরস্ত করতে।

ইতিমধ্যে ১৯০৯ সালে রামানুজন বিয়ে করেন। তখন চাকরি তাঁর কাছে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ১৯১২ সালের মার্চ মাসে তিনি মাদ্রাজের পোর্টট্রাস্ট অফিসে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে কেরাণীর কাজ পান। চাকরির কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অঙ্ক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যান।

এই সময় রামানুজনের গণিত-প্রতিভা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯১৩ সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক ৭৫ টাকার একটি রিসার্চ স্কলারশিপ পান এবং পূর্ণোদ্যমে গবেষণা চালাতে থাকেন।

রামানুজনের প্রথম জীবনের গবেষণা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে —'জার্নাল অফ দি ইণ্ডিয়ান ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটিতে'। অনেকের অনুরোধে এই সময় রামানুজন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক হার্ডির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। ১৯১৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তিনি অধ্যাপক হার্ডিকে একখানি চিঠি লেখেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর আবিষ্কৃত কতকগুলি গাণিতিক সূত্র তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন।

রামানুজনের চিঠি ও গাণিতিক সূত্রগুলি হাতে পেয়ে অধ্যাপক হার্ডি অবাক হয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন যে, এই ভারতীয় যুবকের গাণিতিক প্রতিভা অসামান্য। এমন প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। তাই

অধ্যাপক হার্ডি রামানুজনকে বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি দিয়ে ১৯১৪ সালের ১৭ই মার্চ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যান। সেখানে রামানুজন অধ্যাপক হার্ডি ও অধ্যাপক লিট্‌ল্‌উডের অধীনে গবেষণা করতে থাকেন। কিছুকাল পরে রামানুজন সম্পর্কে মন্তব্য করে অধ্যাপক হার্ডি বলেছিলেন, রামানুজনকে পড়াতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, তাঁকে আমি যত না দিয়েছি, তাঁর কাছে আমি শিখেছি অনেক বেশী।

লণ্ডনে থাকাকালে একটানা তিন বছর ধরে খেটে রামানুজন চারশো পৃষ্ঠার মৌলিক গবেষণার বিষয়বস্তু প্রকাশ করলেন। গণিত বিষয়ে তাঁর গবেষণায় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হলেন। বিশ্বের সর্বত্রই তাঁর গাণিতিক প্রতিভা স্বীকৃতি পেলো।

অর্থের মোহ রামানুজনের আদৌ ছিল না। বিলেতে তিনি যে বৃত্তি পেতেন, তা তাঁর জীবনধারণের পক্ষে অতিরিক্ত ছিল। তাই তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারকে লিখেছিলেন: আমি আশা করি যে, আমার ইংল্যাণ্ডে বাস করবার ন্যূনতম ব্যয় মিটিয়ে বছরে ৫০ পাউণ্ড আমার বাবা-মাকে দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের কলেজের বেতন ও পুস্তক ক্রয় ইত্যাদি বাবদ খরচ করা হবে।

রামানুজনের প্রতিভা যখন পরিপূর্ণ বিকাশের পথে, ঠিক তখনই ঘটলো অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। তিনি আক্রান্ত হলেন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে। বিলাতের চিকিৎসা নিষ্ফল হলো। রামানুজন ফিরে এলেন স্বদেশে এবং জন্মভূমির বুকেই ১৯২০ সালের ২৬শে এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

—

সি ভি রামন

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৮—১৯৭০)

১৯২৫ সাল।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার। আর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। কথায় কথায় একদিন অধ্যাপক রামন স্যার আশুতোষকে বললেন: আমাকে কাজ করবার সুযোগ দিন। পাঁচ বছরের মধ্যেই আমি নোবেল পুরস্কার এনে দেব।

রামন তাঁর দম্ভোক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। পদার্থ

বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৩০ সালে। তাঁর এই কৃতিত্বে শুধু ভারত কেন, সমগ্র এশিয়া মহাদেশও গর্বিত। কারণ এশিয়ায় তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনোপল্লীতে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা পদার্থবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন আর মাতা ছিংলন ধর্মশীলা ও অধ্যবসায়ী মহিলা।

ওয়ালটেয়ারে রামনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। মাত্র তের বছর বয়সে সেখানকার কলেজ থেকেই এফ এ পাশ করে তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ ক্লাশে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকেই তিনি প্রথম বিভাগে বি এ এবং এম এ পাশ করেন। পদার্থবিদ্যা তাঁর প্রিয় পাঠ্যবিষয় ছিল। বি এ-তে পদার্থবিদ্যায় তিনি স্বর্ণপদক পান। তাঁর আগে মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় কেউ প্রথম বিভাগে পাশ করেননি। বি এ ডিগ্রী লাভ করার আগেই রামন বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

কলেজে ঢোকার পর থেকেই রামন শব্দ, তাপ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানবার জন্য আগ্রহ সহকারে পড়াশুনায় ব্যাপৃত থাকতেন। ছাত্রাবস্থায় অস্বাভাবিক পরিশ্রমের ফলে তিনি এক সময় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সেই অবস্থাতেই একদিন তিনি 'লিডেন জারের' পরীক্ষা দেখবার জন্য অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন এবং পরীক্ষাটি না দেখে ঘুমুতে যাবেন না বলে জেদ ধরেন। অগত্যা ছেলেকে রাত্রি জাগরণ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্য তাঁর বাবা চন্দ্রশেখর আয়ারকে লিডেন জারের পরীক্ষা দেখাতে হয়।

এম এ ক্লাশে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল না। তা ছাড়া ভাল ছেলে বলে লাইব্রেরী থেকে বই নেবার জন্য তাঁকে কোন নিয়মও মেনে চলতে হতো না। এই সময় 'প্রিজম' নিয়ে পরীক্ষা করবার সময় একদিন তিনি একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। ঐ বিষয়ে অনেক পড়াশুনা করলেন কিন্তু ঐ ব্যাপারের কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। ফলে তাঁর মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠলো। পরের দিন তিনি বার বার সেই পরীক্ষাটি করে এর কারণ সম্বন্ধে এক নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং সে বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক জোন্স সাহেবের হাতে দেন। পরে ঐ নিবন্ধে আরও কিছু নতুন তথ্য যোগ করে তা বিজ্ঞান-বিষয়ক

একটি বৃটিশ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৯০৬ সালে লণ্ডনের ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে আলো সম্বন্ধে তাঁর একটি নতুন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ সালে বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় তাঁর আর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯০৭ সাল।

রামনের বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর। এই বছরেই রামন পদার্থ বিজ্ঞানে এম এ পাশ করলেন প্রথম স্থান অধিকার করে। পেলেন স্বর্ণপদক।

ঐ সময় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের উচ্চাকাজ্ক্ষা পূরণের কোন সুবিধা ছিল না। কাজেই রামন ভারত সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় তিনি মাত্র উনিশ বছর বয়সে গেজেটেড অফিসাররূপে ভারতীয় ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টে ডেপুটি অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেলের পদে নিযুক্ত হলেন। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি কলকাতা, নাগপুর ও রেঙ্গুনে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দীর্ঘ দশ বছর সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকলেও রামন কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিরত থাকেননি। এই সময়ের মধ্যে নেচার, ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিজিক্যাল রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত অনেক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষ রামনকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের 'পালিত অধ্যাপক' পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। রামন ঐ পদ গ্রহণ করেন। এতদিন রামন প্রধানতঃ শব্দ বিজ্ঞান, বাদ্যযন্ত্রের শব্দতত্ত্ব ও আলোর তরঙ্গ ধর্মের ওপর গবেষণা করে-ছিলেন। এবার পদার্থের অনুসমূহ কর্তৃক আলোক বিচ্ছুরণ তত্ত্বে তিনি আকৃষ্ট হলেন। ১৯১৯ সালে এই বিষয়ে তাঁর প্রথম গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হলো 'নেচার' পত্রিকায়। আবার ১৯২১ সালে ঐ পত্রিকাতেই আণবিক বিচ্ছুরণ সম্পর্কিত তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হলো। আকাশ কেন নীল, বিভিন্ন সমুদ্রের জল বিভিন্ন রকমের নীল কেন—এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ইংরাজ বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে তিনি পরীক্ষার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। ফলে ১৯২৪ সালে রামন

লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হলেন।

এর চার বছর পরে ১৯২৮ সালে আলোকের বিচ্ছুরণ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে অধ্যাপক রামন এক আশ্চর্য আবিষ্কার করেন। আবিষ্কারটি মোটামুটি এই রকম : যদি একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি বেনজিন, টলুইন প্রভৃতি জৈব তরল পদার্থের উপর ফেলা যায়, তবে ঐ তরল পদার্থ থেকে বিচ্ছুরিত আলোতে আপতিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছাড়াও ক্ষুদ্রতর এবং দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের প্লেটে ধরা পড়ে। অধ্যাপক রামন প্রমাণ করেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যটি সম্পূর্ণ নতুন এক প্রক্রিয়া এবং আণবিক বিচ্ছুরণের সঙ্গেই এটি সংশ্লিষ্ট। এই অভিনব আবিষ্কারটি বিজ্ঞান জগতে 'রামন এফেক্ট' নামে পরিচিত। আর এই আবিষ্কারের জন্যই রামন ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলকাতার বৌবাজার ষ্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণাগারে রামন তাঁর প্রথম জীবনের অধিকাংশ গবেষণার কাজ পরিচালনা করেছিলেন। পরে তিনি সেখানকার অবৈতনিক কর্মসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণে অধ্যাপক রামন পৃথিবীর অনেক দেশেই ঘুরে এসেছেন, কুড়িয়ে এনেছেন অনেক সম্মান। ক্রষ্ট্যালোগ্রাফী সম্পর্কিত গবেষণায় রামন খুব আগ্রহী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে হার্ভার্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রষ্ট্যালোগ্রাফী কংগ্রেসে তিনি যোগদান করেছিলেন। এক্স-রশ্মির ডিফ্র্যাক্‌শন ও ফুলের রঙ সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখ-যোগ্য গবেষণা করে গেছেন।

১৯৩৩ সালে অধ্যাপক রামন কলকাতা ছেড়ে চলে যান বাঙ্গালোরে। সেখানে তিনি ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৪৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'রামন রিসার্চ ইনষ্টি-টিউট'। বাকি জীবনটা অধ্যাপক রামন এইখানেই গবেষণা করে কাটিয়ে দেন। ১৯৫৪ সালে তাঁকে 'ভারত রত্ন' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তার আগে ১৯৪৯ সালে তিনি জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

অধ্যাপক রামন ছিলেন স্পষ্টবক্তা।

একবার অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের একটি আদেশের সমালোচনা করলেন তিনি। তাতে সাহেব খুব রেগে গিয়ে কাগজপত্র রামনের ঘরে

ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর টেবিলে রাখা একটি লাল কালির বোতল দেখিয়ে বললেন ঃ শুনুন মিষ্টার রামন, এই লাল কালির বোতল দেখিয়ে যদি আমি বলি যে, এতে কালো কালি আছে, তবে আপনার কর্তব্য সেই কথায় সায় দেওয়া। বুঝলেন?

রামন উত্তর দিলেন ঃ সেক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হবে আপনাকে অন্ধ নয়তো পাগল বলা।—এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রামন সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন।

এতবড় বৈজ্ঞানিক কিন্তু নাস্তিক ছিলেন না। তিনি বলতেন ঃ ভগবান যদি সত্যিই থাকেন, তাহলে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা তাঁর অনুসন্ধান করব। ব্রহ্মাণ্ডে তিনি যদি না থাকেন, তাহলে তাঁকে খোঁজবার কোন সার্থকতা নেই। বিভিন্ন মহলে আমাকে নাস্তিক বলে ভাবা হয়, কিন্তু আমি তা নই। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানে যে নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, তার মধ্য দিয়েই ভগবান আমার কাছে ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছেন।

—
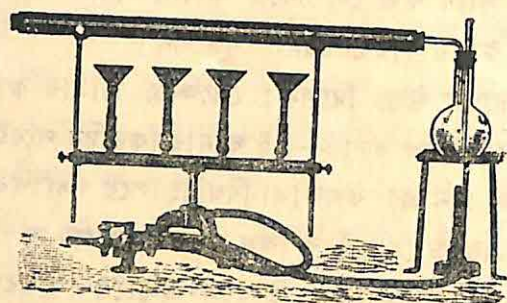
ডঃ ওয়াক্সম্যান

সুইডেনের 'ষ্টকহোল্‌ম কনজারভেটরী হল'।

১৯৫২ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শারীরবিদ্যা বিষয়ে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত বিজ্ঞানীকে এই হলে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার আয়োজন হয়েছে। পুরস্কার প্রদান করতে এসেছেন সুইডেনের রাজা 'গুস্তাভ'। পুরস্কার গ্রহণ করতে এসেছেন ডক্টর সেলমন অ্যাব্রাহাম ওয়াক্সম্যান।

ডক্টর ওয়াক্সম্যান পুরস্কার গ্রহণ করলেন। অগণিত দর্শক হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করলো। তারপর তাঁকে অভিনন্দিত করতে এগিয়ে এল—পাঁচ বছরের একটি মেয়ে। হাতে তার পাঁচটি লাল গোলাপের একটি পুষ্পস্তবক। মেয়েটি সেই পুষ্পস্তবক উপহার দিল বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যানকে। উপহার গ্রহণ করে ওয়াক্সম্যান বললেন : এই উপহারটিকে আমি নোবেল পুরস্কারের চেয়েও বেশী সম্মানজনক পুরস্কার বলে মনে করি, কারণ পাঁচ বছর আগে যক্ষ্মারোগে এই মেয়েটি মরতে বসেছিল। আমার আবিষ্কৃত ওষুধ ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রয়োগে এই মেয়েটির জীবন রক্ষা পায়। এর উপহার দেওয়া পুষ্পস্তবকের পাঁচটি গোলাপ মেয়েটির রোগমুক্ত নতুন জীবনের পাঁচটি বছরের স্মারক চিহ্ন আর আমার জীবনেরও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান।

ওয়াক্সম্যানের জন্ম হয় ১৮৮৮ সালের ৮ই জুলাই তারিখে সোভিয়েট রাশিয়ার ইউক্রেন প্রদেশের এক পল্লীগ্রামে। গ্রামটির নাম নেভাইয়াপ্রিলুকা।

ওয়াক্সম্যানের পিতা জ্যাকব ছিলেন ব্যবসায়ী।

নেভাইয়াপ্রিলুকার পার্শ্ববর্তী শহর লিনিৎসাতে তাঁর তামার তৈজসপত্র নির্মাণের ব্যবসা ছিল। জ্যাকব এত কর্মব্যস্ত মানুষ ছিলেন যে, সংসারের দিকে তাকাবার ফুসরত তাঁর ছিল না। কাজেই সেলমনের শৈশবের শিক্ষা-দীক্ষা যা কিছু—সবই তাঁর মায়ের কাছে।

কৈশোরের এক পারিবারিক দুর্ঘটনা সেলমনের জীবনে গভীর রেখাপাত করে। উপযুক্ত ওষুধের অভাবে ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত নিজের ভগিনীকে চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করতে দেখেন 'সেলমন'। সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের কথা বড় হয়েও ভুলতে পারেননি তিনি। সেদিন কিশোর সেলমন শপথ নিয়েছিলেন—ডাক্তার হবেন এবং ডিপথেরিয়ার মত সাংঘাতিক ব্যাধিগুলিকে দমন করবার উপযুক্ত ওষুধ আবিষ্কার করবেন।

১৯১০ সালে ওয়াক্সম্যান যখন বাইশ বছরের যুবক, তখন তাঁর মা মারা যান এবং ইউক্রেনের সঙ্গে তাঁর সকল সংযোগ ছিন্ন হয়। জ্যাকব উপদেশ দেন, জুরিখে গিয়ে ইণ্ডাস্ট্রীয়াল কেমিষ্ট্রী পড়তে কিন্তু পিতার উপদেশ ওয়াক্সম্যানের মনঃপূত হয় না। তিনি আমেরিকায় চলে আসেন এক আত্মীয়ের কাছে। আত্মীয়টি এক বিরাট খামারের মালিক ছিলেন।

খামারে চাষ-আবাদ হয়, আর যুবক ওয়াক্সম্যান তা দেখেন। দেখেন মাটি থেকে উদ্ভিদকে প্রাণ লাভ করতে। দেখতে দেখতে একদিন তাঁর মনে জাগে সেই চিরন্তন প্রশ্ন—কোথা থেকে এবং কিভাবে এই প্রাণের উৎপত্তি? এই দার্শনিক তত্ত্বের বিষয় চিন্তা করতে করতে ভুলে যান ওয়াক্সম্যান তাঁর কৈশোরের শপথের কথা—চিকিৎসক হবার কথা।

এমন সময় রুজার্স-এ নিউজার্সি কৃষিবিদ্যা গবেষণাকেন্দ্রের অধিকর্তা ডক্টর জ্যাকব লিপম্যানের সঙ্গে ওয়াক্সম্যানের পরিচয় হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিউজার্সির রুজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা-রসায়ন পড়তে শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে একটি বৃত্তি দেওয়া হয়। ওয়াক্সম্যান রাত্রে আত্মীয়ের খামারে চৌকিদারের কাজ করতেন, আর সারাদিন বসে পড়াশুনা করতেন। এমনিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের দুটি বছর কেটে

যায়। ১৯১৫ সালে তিনি মৃত্তিকা-রসায়নে ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু এরই মধ্যে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কারের প্রথম অধ্যায় শেষ করে ফেলেছিলেন। কারণ, মৃত্তিকায় 'ষ্ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস' নামক এক জাতীয় আণুবীক্ষণিক জীবাণুর সন্ধান পেয়ে তিনি তার উপরে একটি গবেষণাপত্র লিখে ফেলেছিলেন।

এমন সময় ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বছর গবেষণার জন্য একটি বৃত্তি পান ওয়াক্সম্যান। সেখানে দু'বছর গবেষণার পর তিনি মৃত্তিকা-রসায়নে ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়ে রুজার্সে ফিরে আসেন এবং সেখানকার কৃষি মহাবিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজিষ্টের পদে যোগ দেন। বাৎসরিক বেতন তখন দেড় হাজার ডলার।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুন আমেরিকায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ঐ স্বল্প বেতনে সংসার চলে না ওয়াক্সম্যানের। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছাড়বার অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্থের জন্য গবেষক হিসাবে তাঁকে অন্য একটি ফার্মে যোগ দিতে হলো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেখানে বেশীদিন থাকতে হলো না। ইতিমধ্যে রুজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে অধিক বেতন দিয়ে আবার পূর্বপদে ফিরিয়ে আনলেন।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ওয়াক্সম্যানের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল—মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা। এই দশ বছর হাজার হাজার ঘণ্টা ল্যাবরেটরিতে কাটিয়ে ওয়াক্সম্যান প্রায় সব রকম মৃত্তিকারই উর্বরতা বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করেন এবং তার ফলে গোটা বিশ্বের কৃষককূল অশেষ উপকৃত হয়। এই সময় নাইট্রোজেনের উপর গবেষণা করে ওয়াক্সম্যান ১৬০০ ডলার পুরস্কার পান।

১৯২৮ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংয়ের পেনিসিলিন আবিষ্কারের ফলে জীবাণুবিদ্যার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়। জীবাণুর বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের এইখানেই শেষ হলো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকে ওয়াক্সম্যানের নিরলস গরেষণার ফলে পেনিসিলিনের মত শক্তিশালী আরও একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হলো। তার নাম ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন। সেটা ১৯৪২ সাল। এই ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন বর্তমানে যক্ষ্মারোগ দমনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

এই নতুন অ্যান্টিবায়োটিকটি ওয়াক্সম্যান আবিষ্কার করেছিলেন রুজার্স

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকালে। কিন্তু এই গবেষণার যাবতীয় ব্যয় বহন করেছিলেন আমেরিকার 'মার্ক অ্যাণ্ড কোম্পানী' নামে এক বিখ্যাত ঔষধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। শর্ত ছিল যে, গবেষণার ফলে যদি এমন কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়, যার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব—তাহলে মার্ক কোম্পানীই সেই ওষুধ উৎপাদনের একমাত্র অধিকারী হবেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, বিশ্বে এই নতুন অ্যান্টিবায়োটিকটির চাহিদা এত বেশী যে, একমাত্র মার্ক কোম্পানীর পক্ষে তা সরবরাহ করা অসম্ভব। তাই মার্ক কোম্পানী তাঁদের শর্ত তুলে নিলেন এবং তার ফলে বিশ্বের যে কোন ঔষধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই ওষুধটি প্রস্তুত করবার আইনগত কোন বাধা রইলো না।

মার্ক কোম্পানী ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন উৎপাদনের স্বত্ব ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াক্সম্যান তাঁর এই আবিষ্কারের পেটেন্ট ও রয়্যালটির স্বত্ব দান করলেন রুজার্স বিশ্ববিদ্যালয়কে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সেই টাকার শতকরা কুড়ি ভাগ আবিষ্কর্তার প্রাপ্য হিসাবে লেখাপড়া করে দিয়ে উদারতা দেখালেন। ওয়াক্সম্যান কিন্তু সে অর্থ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় না করে সবটাই ব্যয় করলেন মাইক্রোবায়োলজির গবেষণায়।

ওয়াক্সম্যানের গবেষণার অন্ত নেই। সারা জীবনে তিনি প্রায় সাড়ে তিনশো গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন ও মাইক্রোবায়োলজির উপর বারোখানি বই লিখেছেন। তাছাড়া নিজেই আবিষ্কার করেছেন ডজনখানেক অ্যান্টিবায়োটিক। সেগুলির মধ্যে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ও নিওমাইসিন অন্যতম। ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কারের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি পেয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার। কিন্তু তার চেয়েও বড় সম্মান জুটেছে ওয়াক্সম্যানের ভাগ্যে এবং তা হচ্ছে বিশ্বের অগণিত রোগক্লিষ্ট মানুষের অন্তরের আশীর্বাদ।

—

মেঘনাদ সাহা

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৩—১৯৫৬)

১৯০৫ সাল।

ভারতে স্বদেশী আন্দোলন তখন প্রবলভাবে চলছে। আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছে স্কুল-কলেজেও। ছাত্ররা বিদেশী জিনিস বয়কট করছে, বর্জন করছে বিদেশী কাপড়, বিদেশী জুতো।

বারো বছরের একটি বালক। স্কুলে পড়ে সে। স্বদেশী আন্দোলনে সাড়া দিয়ে সে খাদির পোষাক পরতে শুরু করেছে, বিদেশী জুতো বর্জন করে খালি পায়েই স্কুলে যাতায়াত করছে। বিদ্যালয় পরিদর্শক একদিন তা দেখলেন। সেইদিনই তিনি নির্দেশ দিলেন—ছেলেটিকে এরপর থেকে জুতো পায়ে দিয়ে স্কুলে আসতে হবে।—এ আদেশ কিন্তু পালন করলো না

ছেলেটি। ফলে বৃত্তি ও বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো সে। কিন্তু প্রতিভাকে দাবিয়ে রাখা যায় না। ভবিষ্যতে এই ছেলেটিই হয়ে উঠলো মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক। ডক্টর মেঘনাদ সাহা নামে সে হলো প্রসিদ্ধ।

১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখে ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে মেঘনাদের জন্ম হয়। তাঁর পিতা জগন্নাথ সাহা ছিলেন সামান্য একজন ব্যবসায়ী। সংসারে আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল না। অভাব-অনটনের মধ্যে মেঘনাদের শৈশবকাল কাটে। তিনি প্রথমে ভর্তি হন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখানকার পাঠ শেষ করে ভর্তি হন মাইল সাতেক দূরে শিমূলিয়া গ্রামের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে। এখান থেকে তিনি মধ্যবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় একটি বৃত্তি পান। বৃত্তি পাওয়ার ফলে তাঁর পড়াশুনার খুব সুবিধা হয়। কারণ তখন তাঁর পিতার পক্ষে পুত্রের পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার ছিল।

এরপর মেঘনাদ যান ঢাকায়। ভর্তি হন সেখানকার কলেজিয়েট স্কুলে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁকে ঐ স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। অগত্যা মেঘনাদ ভর্তি হন ঢাকা জুবিলী স্কুলে। ১৯০৯ সালে এই স্কুল থেকেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করে মেঘনাদ মাসিক ২০৲ টাকা করে বৃত্তি পান। এবার ঢাকা কলেজ। এখান থেকে ১৯১১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে মেঘনাদ আই এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবারে বৃত্তি পান মাসিক ২৫৲ টাকা করে।

আই এস-সি পাশ করে মেঘনাদ ঢাকা থেকে চলে আসেন কলকাতায়। বি এস-সি পড়তে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। সেখান থেকে ১৯১৩ সালে তিনি গণিতশাস্ত্রে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৫ সালে ফলিত গণিতশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে তিনি এম এস-সি পাশ করেন। এর চার বছর পরে মেঘনাদ ডি এস-সি ডিগ্রী ও তারপর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন।

এইবার শুরু হয় মেঘনাদের কর্মজীবন—অধ্যাপনা ও সেই সঙ্গে

গবেষণা। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকরূপে তাঁকে দেখা যায় এলাহাবাদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইতিমধ্যে ১৯২৭ সালে তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন। ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্যরূপে তিনি ঘুরে আসেন ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া। লণ্ডনে অধ্যাপক ফাউলারের অধীনে এবং জার্মানীতে অধ্যাপক নার্নস্টের অধীনে ডক্টর সাহা কিছুকাল গবেষণা করেন। একটানা পনের বছর ধরে পদার্থ বিদ্যার গবেষণাকার্যে নিযুক্ত থেকে বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন।

অধ্যাপক সাহার গবেষণালব্ধ ফল 'তাপীয় আয়ননবাদ' নামে সুপরিচিত। তাপ প্রয়োগে আয়নন প্রক্রিয়াকে 'তাপীয় আয়নন' বলা হয়। অধ্যাপক সাহা একটি সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন উষ্ণতায় ও চাপে বিভিন্ন পদার্থের আয়ননের মাত্রা গণনা করেন। এই তাত্ত্বিক গবেষণার বহুমুখী প্রয়োগ দেখা যায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়। তাপীয় আয়ননবাদ সূত্রের প্রথম প্রয়োগ হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে। তাঁর এই সূত্র প্রয়োগ করে জানা যায় যে, সৌরমণ্ডলে রুবিডিয়াম, সিজিয়াম প্রভৃতি মূল পদার্থগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আয়নিত অবস্থায় থাকে। সৌর কলঙ্কের উষ্ণতা সূর্যের উষ্ণতা অপেক্ষা কম। তাই সৌর কলঙ্কের বর্ণালী একটু ভিন্ন ধরনের হয়। এই পার্থক্যও তাপীয় আয়ননবাদের মূল সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। ডক্টর সাহা বিভিন্ন নক্ষত্রের আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে ঐ সব নক্ষত্রের পৃষ্ঠতাপমাত্রা নির্ণয় করতে সক্ষম হন। সৌরচ্ছটার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান গবেষণা বিশ্বের বিজ্ঞান-সমাজে সমাদর লাভ করে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বর্ণালী বিশ্লেষণের বিভিন্ন পরীক্ষা ও মৌলিক মতবাদের স্রষ্টারূপে অধ্যাপক সাহা পৃথিবীর একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরূপে সম্মানিত হন। জীবনের শেষ কয়েক বছর অধ্যাপক সাহা আয়নযুক্ত উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল দিয়ে রেডিও তরঙ্গের গমনাগমন সম্পর্কে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন।

অধ্যাপক সাহা কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'সাহা ইনস্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'। এখানে সাইক্লোট্রন, নিউক্লিয়ার ইণ্ডাক্শন্, মাস্ স্পেক্ট্রোমিটার, বিটা-রে স্পেক্ট্রোমিটার প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক যন্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষার প্রচেষ্টায় তিনি বিরাট সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর

দূরদর্শিতা এত প্রখর ছিল যে, তিনি বহু পূর্বে যেসব পরিকল্পনার কথা বলে গেছেন, আজকের মানুষ সে-সবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। নদী পরিকল্পনা ও বিভিন্ন জাতীয় বিজ্ঞান মন্দিরের গোড়াপত্তন হয় তাঁর পরিকল্পনামতই। অধ্যাপক সাহা 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। আজও সেই পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি মহান বৈজ্ঞানিকই ছিলেন না, বড় সমাজসেবীও ছিলেন। ভারতের বিজ্ঞান সাধনাকে তিনি পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে সমপর্যায়ে আনবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাত্ত্বিক বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করলেও ব্যবহারিক বিজ্ঞান দ্বারা কি ভাবে জাতির কল্যাণ সাধন করা যায়, সে বিষয়েও ডক্টর সাহা নিরন্তর চিন্তা করতেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হওয়া তিনি দেখে যেতে পারেননি। নিয়তির লিখন অনুযায়ী ১৯৫৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁকে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হয়েছে।

—

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

(খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৪-১৯৭৪)

বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের নামের সঙ্গে যে ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম ইতিহাসের পাতায় চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে—তিনি হলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। 'বোস-আইনষ্টাইন স্ট্যাটিস্‌টিকস্' বা 'বসু-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' মৌল পদার্থ বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী অবদান। আর এই সংখ্যায়নের মূল প্রবক্তা হলেন আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু তখনকার ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইন্‌জিনিয়ারিং বিভাগে অ্যাকাউন্টেন্ট-এর কাজ করতেন। মাতা আমোদিনী দেবী ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী মতিলাল রায় চৌধুরীর কন্যা। গণিত শাস্ত্রের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আবার গীতা থেকে যে কোন অংশ তিনি অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। সরকারী চাকরী করলেও নানারকম কাজকর্মের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়েছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'-এর তিনি ছিলেন

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পিতার মত সত্যেন্দ্রনাথও গণিত শাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। পিতার মত তিনিও উত্তরকালে নানা গঠনমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

মায়ের কাছে সত্যেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন অফুরন্ত আদর। এক পুত্র আর ছয় কন্যার জননী ছিলেন আমোদিনী দেবী। একবার কে যেন মন্তব্য করেছিলেন ঃ বার বার মেয়ে হচ্ছে, আরও একটি ছেলে হলে ভাল হতো। —উত্তরে আমোদিনী দেবী বলেছিলেন ঃ না, একটাই থাক। আমি এক ডজন মেয়ে পালন করতে পারি কিন্তু তেমন ছেলেতে আমার কাজ নেই, যে সত্যেনের ভাই হওয়ার উপযুক্ত যোগ্যতা রাখে না।—মায়ের এ উক্তি থেকেই বোঝা যায়, তিনি পুত্রগর্বে কতটা গর্বিতা ছিলেন। সত্যিই সত্যেন্দ্রনাথের মত প্রতিভাবান পুত্রসন্তান লাভ করা যে কোনও মায়েরই গর্বের বিষয়।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার হিন্দু স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে সত্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে যান। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র। ১৯১১ সালে এফ এ পরীক্ষা থেকে শুরু করে ১৯১৫ সালে মিশ্র গণিতে এম এস-সি পরীক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। যে কোনও গাণিতিক সমস্যা একেবারে মূল নিয়ম থেকে শুরু করে পুরোপুরি ভাবে করে ফেলা—সত্যেন্দ্রনাথের জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ছাত্রাবস্থায় তিনি সতীর্থ হিসাবে পেয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি, নিখিল সেন, পুলিন সরকার প্রমুখ কৃতী ছাত্রদের। প্রেসিডেন্সী কলেজে বা কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসে এতগুলি প্রতিভাবান ছাত্রের সমাবেশ বোধহয় আর কখনও হয়নি। এঁদের সঙ্গে, বিশেষ করে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে আলাপ-অলোচনা ও প্রতিযোগিতা থেকে বিজ্ঞানের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চায় উদ্দীপনা পান ও নিজ মূল্যায়নে সক্ষম হন। আবার প্রেসিডেন্সী কলেজে সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, অধ্যাপক ডি, এন, মল্লিক, অধ্যাপক কালিস প্রমুখ কৃতী অধ্যাপকবৃন্দকে শিক্ষক হিসাবে পান। এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জনের সাহচর্যে এসে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ জাগে। সেই আগ্রহ ও সেই ঔৎসুক্যের দীপশিখাটি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত

অম্লান ছিল।

প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যেসব কৃতী তরুণ ছাত্রদের কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্য আহ্বান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন অন্যতম। কি উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেছিলেন জিজ্ঞাসা করলে সত্যেন্দ্রনাথ বলতেন: আমরা বিজ্ঞান চর্চা করতে শুরু করেছিলাম দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রথমতঃ, বিদেশীদের মুখের দিকে না চেয়ে থেকে আমাদের বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারটা আমরাই গড়ে নেব। দ্বিতীয়তঃ, চেয়েছিলাম সাহেবদের দেখাতে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমাদেরও পারদর্শিতা কম নয়। মেঘনাদ, জ্ঞান ঘোষ, আমি —আমরা সবাই এ দুটি কথা মনে রেখেই কাজ করার চেষ্টা করেছি।

এম এস-সি পাশ করার পর সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে গণিত ও পদার্থবিদ্যা অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি ও মেঘনাদ সাহা একটি মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেটির নাম 'সাহা-বোস ইকুয়েশন অফ স্টেট'। আবার এই সময়েই এই দুই উদীয়মান বিজ্ঞানী প্রশান্ত মহলানবীশের সহযোগিতায় আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কিত কতকগুলি নিবন্ধ ইংরেজিতে তর্জমা করেন। বই হিসাবে এগুলি পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৯২১ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই তাঁর মনে সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে নতুন চিন্তাধারা জাগে এবং এ নিয়ে তিনি গভীর অনুশীলন আরম্ভ করেন। আর সেই গবেষণারই ফলশ্রুতি হলো 'বসু-সংখ্যায়ন' বা 'বোস-স্ট্যাটিস্‌টিকস'। অধ্যাপক বসু তাঁর এই গবেষণামূলক নিবন্ধটি অধ্যাপক আইনষ্টাইনের কাছে মতামতের জন্য পাঠান। আইনষ্টাইন ঐ নিবন্ধটির সারবত্তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নিজেই অনুবাদ করে জার্মানীর বিশিষ্ট পত্রিকা 'সাইৎস্‌শ্রিফ্‌ট কুইর ফিজিক'-এ প্রকাশার্থে পাঠান। ১৯২৪ সালে ঐ পত্রিকায় অধ্যাপক বসুর নিবন্ধটি প্রকাশিক হয় এবং বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়।

বসু-সংখ্যায়ন যখন পরিকল্পিত হয়, তখন আধুনিক কোয়াণ্টাম গতি-বিজ্ঞান গড়ে ওঠেনি। অধ্যাপক আইনষ্টাইন একক পরমাণুর গ্যাসের ক্ষেত্রে বসু-সংখ্যায়ন প্রয়োগ করে এই নতুন সংখ্যাতত্ত্বের পরিবর্ধন করেন।

আর তখন থেকেই এই নতুন গণনা পদ্ধতিটি 'বসু-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত হয়। এর কিছুকাল পরে ১৯২৬ সালে ফের্মি ও ডিরাক নতুন এক প্রকার সংখ্যায়ন প্রবর্তন করেন। সেটি 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত। মৌলিক কণার প্রকৃতি নির্ধারণে এই দুই সংখ্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ফোটন, আলফা কণা, ডয়টেরন প্রভৃতি যেসব মৌলিক কণা 'বসু-সংখ্যায়ন' মেনে চলে তারা 'বোসন' নামে পরিচিত হয়। আর যে সমস্ত কণা 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' মেনে চলে তারা পরিচিত হয় 'ফের্মিয়ন' নামে।

এর অনতিকাল পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে ইউরোপ যান। প্রথমে প্যারিসে। সেখানে মাদাম ক্যুরীর গবেষণাগারে তিনি কিছুকাল তেজস্ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তারপর কিছুকাল বার্লিনের শহরতলী ডালেমে অবস্থিত 'কাইজার উইলহেল্‌ম ইনষ্টিট্যুটে' গবেষণা করেন। ইউরোপে এসে তিনি অধ্যাপক মার্ক, লিজে মাইটনার, অটোহান ও আইনষ্টাইনের সঙ্গে পরিচিত হন। যদিও আইনষ্টাইনের কাছ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ সাধারণ অর্থে উচ্চ পদার্থবিদ্যা শিক্ষার বা গবেষণার কোন পাঠই গ্রহণ করেননি, তবুও একলব্যের মতই আইনষ্টাইনকে তিনি গুরু হিসাবে মনে মনে বরণ করেছিলেন। তাঁর পড়বার ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিলেন আইনষ্টাইনের একটি ফটো।

দু'বছর বিদেশে থেকে বিজ্ঞানানুশীলন করে ঢাকায় ফিরে এসে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদে বৃত হন। সেখানকার পদার্থবিদ্যা বিভাগ তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় শুধু উচ্চশিক্ষা পরিবেশনেই নয়, উচ্চাঙ্গের গবেষণার ক্ষেত্রেও একটি প্রগতিশীল বিজ্ঞান সংস্থারূপে খ্যাতি লাভ করেছিল।

পরবর্তীকালে বহু ঘটনার মধ্য দিয়েই অধ্যাপক বসুর জীবনস্রোত পরিচালিত হয়েছিল। তিনি কাজ করেছিলেন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের ডি-স্কোয়ার সংখ্যায়নের উপর, লেরেঞ্জ গ্রুপের উপর, তাপ-বিকিরণ, কেলাস বিজ্ঞান ও একীকৃত ক্ষেত্রতত্ত্বের উপর। অমায়িকতা ও আন্তরিকতার জন্য ছাত্রেরা সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। তিনি ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, কিন্তু গণিত ও রসায়নের গবেষক। তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক—কোন প্রকার গবেষণাতেই তিনি পিছ-পা হতেন না। উভয়

প্রকার গবেষণার ক্ষেত্রেই তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

১৯৪৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি ঐ বিভাগেরই প্রধান অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। এখানে এসেও অধ্যাপক বসু নিবিষ্টচিত্তে অধ্যাপনা ও গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। বহুবার বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি বিদেশে যান। ১৯৪৮—৫০ সালে ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অফ সায়েন্সের চেয়ারম্যান পদে বৃত হন। ১৯৫৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরের বছর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী দেন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি বৃটেনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার সত্যেন্দ্রনাথকে জাতীয় অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করেন। আমৃত্যু তিনি ঐ পদে থেকেই গবেষণা করে গেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল আচার্য বসুর। ১৯২৮ সালে তিনি পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৪৪ সালে ঐ কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। সারাজীবন বহু সম্মানে ভূষিত হলেও তাঁর অন্তঃকরণ বরাবরই শিশুর মত সরল ছিল।

জীবন সায়াহ্নে সত্যেন্দ্রনাথকে প্রায়ই আক্ষেপ করতে শোনা যেত। তাঁর সমগ্র বিজ্ঞানসাধনা দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে, দেশবাসীর দারিদ্র্য দূর করতে নিয়োগ করা যায়নি বলে তিনি আক্ষেপ করতেন। তাঁর কোন ছাত্র বা কোন ঘনিষ্ঠ কর্মী দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য কিছু করতে পারলে তিনি খুব খুশী হতেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপক প্রচলনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক বাংলা মাসিক পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আচার্য বসু বলে গেছেন : বর্তমান কালের শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে বিজ্ঞান খুব জরুরী। এ সম্বন্ধে কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের দেশে অধিকাংশ জনসাধারণের মধ্যে যদি আমরা বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি প্রচার করতে চাই, তবে সে প্রচার দেশীয় ভাষাতেই করতে হবে—বিদেশী ভাষায় নয়—তা সে বিদেশী ভাষা যত সম্পন্নই হোক

না কেন।

সত্যেন্দ্রনাথ মূলতঃ বিজ্ঞানী হলেও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, দর্শন, ইতিহাস ও মানবসংস্কৃতির সকল বিষয়েই বিশেষভাবে আগ্রহশীল ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে সংস্কৃত, ঐতিহাসিকদের সঙ্গে ইতিহাস, প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, কবিদের সঙ্গে কাব্য, সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে সঙ্গীত—কোন আলোচনাতেই তিনি পেছ-পা হতেন না। তাঁর মত আলাপী লোক খুব কমই চোখে পড়তো। কেউ বড়মানুষ না গরীব, পণ্ডিত না মূর্খ, বৃদ্ধ না বালক—ব্যক্তিগত ব্যবহারে সে-সব নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। যে কোন মানুষের সঙ্গে তিনি মুহূর্তে সহজ ভাবে মিশে যেতে পারতেন। পরকে আপনার করে নেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অপরিসীম। এত বড় বিজ্ঞানী কিন্তু সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী পুরুষ ছিলেন। সুখ-সম্পদ-বিলাসে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁর মধ্যে আমরা দেখেছি বিপুল প্রতিভার সঙ্গে বিশাল হৃদয়ের মিলন। তিনি ছিলেন পরোপকারী, বন্ধু ও ছাত্রবৎসল, সর্বগুণগ্রাহী ও স্বদেশপ্রেমিক পুরুষ।

আজ সত্যেন্দ্রনাথ ইহজগতে নেই। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে, কিন্তু তাঁকে আমরা ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারবও না কোনদিন। একদিকে অসামান্য বিজ্ঞান প্রতিভা, অন্যদিকে তাঁর হৃদয়বত্তা—এই দুই গুণের জন্যই আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বিশ্ববাসীর হৃদয়ে।

—
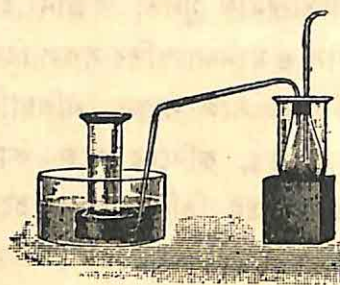
রবার্ট ওপেনহিমার

(খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৪—১৯৬৭)

১৯৪৫ সাল। ১৬ই জুলাই, সোমবার।

সময়—ভোর ৫টা বেজে ২৯ মিনিট।

নিউ মেক্সিকোর মরুভূমির মাঝে ছোট্ট একটি পাহাড়। নাম তার 'জিরো হিল'। জিরো হিলের চূড়ায় স্থাপন করা হয়েছে একশো ফুট উঁচু এবং ৩২ টন ওজনের একটি স্তম্ভ। সেই স্তম্ভের চূড়ায় রাখা হয়েছে একটি ধাতব ক্যাপসুল। ক্যাপসুলটি থেকে অনেকগুলি তার নেমে গেছে মাটির নীচে। এই তারগুলি মাটির তলা দিয়েই চলে গেছে নয় মাইল দূরে 'কণ্ট্রোল রুমে'। 'কণ্ট্রোল রুম'টি মরুভূমির বালির নীচে। অনেকটা জায়গা জুড়ে তার অবস্থান। সেখানে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা, পদাতিক বাহিনীর কর্মচারীরা, আর সুদক্ষ যন্ত্র বিশেষজ্ঞরা। এঁদেরই মধ্যমণি হলেন ডক্টর ওপেনহিমার—আমেরিকার পারমাণবিক বোমা নির্মাণ প্রকল্পের সর্বাধিনায়ক।

সাড়ে পাঁচটা বাজতে আর ঠিক ৪৫ সেকেণ্ড বাকি।

ডক্টর জোসেফ ম্যাক্‌কিবেন নামে এক তরুণ বিজ্ঞানী এগিয়ে গেলেন। টিপলেন একটি বৈদ্যুতিক সুইচ। বিদ্যুৎ তরঙ্গ অমনি ছুটে চললো তার বেয়ে নয় মাইল দূরে ঐ স্তম্ভের ওপর বসানো ক্যাপসুলটিতে।

হ্যাঁ; ঐ ক্যাপসুলটিই পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বোমা। সকাল

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় বিস্ফোরণ ঘটলো। নানা রঙে রঞ্জিত আগুনের গোলা আকাশের সাত মাইল ঊর্ধ্বে উঠে গেল। সাড়ে চারশো মাইল দূরেও শোনা গেল বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ। ঘরবাড়ী কেঁপে উঠলো। একশো ফুট উঁচু স্তম্ভটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। স্তম্ভের নীচের বিস্তীর্ণ এলাকার বালি গলে কাচে পরিণত হলো। স্তম্ভের চারপাশের একমাইল পরিমিত স্থানের মধ্যে প্রাণের কোন অস্তিত্বই আর রইলো না।

পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষার সূচনা হলো এইভাবেই। আর এই বোমা তৈরির কৃতিত্ব যে বিজ্ঞানীর, তিনি সেদিন বললেন: আমি আজ এক জগৎ ধ্বংসকারী মহামরণের খেলায় মত্ত হয়েছি।

হ্যাঁ, মহামরণের খেলাই বটে।

ওপেনহিমারের এই পারমাণবিক বোমাই মাত্র তিন সপ্তাহ পরে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এর আগে এত বড় নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটতে আর কখনও দেখা যায়নি।

কিন্তু কি পরিচয় এই ওপেনহিমারের—এই মারাত্মক মারণাস্ত্রটির উদ্ভাবকের?—সেই কথাই এখন বলব।

নিউইয়র্কের এক অভিজাত ইহুদী পরিবারে রবার্ট ওপেনহিমার জন্মগ্রহণ করেন। জন্মদিন—২২শে এপ্রিল, ১৯০৪ সাল। শৈশব কাটতে না কাটতেই বোঝা গেল যে, রবার্ট সাধারণ ছেলে নন। অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন তিনি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিভার স্ফুরণ ঘটতে লাগলো।

মাত্র সাত বছর বয়সেই নানারকম পাথর সংগ্রহ করে রবার্ট রীতিমত ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা শুরু করে দিলেন। তাঁর ছিল একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র। তাই দিয়ে তিনি জীবাণু পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ঐ বয়সেই অনেকগুলো বিদেশী ভাষা তিনি রপ্ত করে ফেললেন। শুধু কি তাই! ভাল গাইয়ে এবং ছবি আঁকিয়ে হিসাবেও বেশ নাম করে ফেললেন।

প্রতিভাবান ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য 'এথিকাল কালচার স্কুল' ছিল নিউইয়র্কে। রবার্টকে সেই স্কুলে ভর্তি করা হলো। মাত্র বারো বছর বয়সে রবার্টের ঝোঁক চাপলো রসায়ন বিদ্যা শিক্ষার। দেখা গেল—

মাত্র ছ' সপ্তাহেই রবার্ট পুরো এক বছরের পাঠ আয়ত্ত করে ফেলেছেন। গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, ল্যাটিন এবং ইটালিয়ান ভাষা সুন্দরভাবে রপ্ত করেই ক্ষান্ত হলেন না রবার্ট। ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখতেও শুরু করে দিলেন। ভাবলেন—পৃথিবীর সব ভাষা শিখে নিয়ে সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ে সারা জীবনটা সুখে কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা আর হলো না। কারণ, মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে লেখাপড়া শেষ করে রবার্ট ভর্তি হলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। বয়স তখন মাত্র উনিশ বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিদ্যার চার বছরের পাঠ্যক্রম তিন বছরে সম্পূর্ণ করে রবার্ট স্নাতক হয়ে বেরুলেন। পরীক্ষায় তিনি এত বেশী নম্বর পেলেন, যা এর আগে আর কেউ পায়নি।

হার্ভার্ডের পাঠ শেষ করে রবার্ট গেলেন কেম্ব্রিজে। সেখানকার বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে পরমাণু বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। এখানে এসে তিনি লর্ড রাদারফোর্ড, ম্যাক্সবর্ণ, নীল্স্ বোর প্রমুখ প্রখ্যাত পরমাণুবিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে এলেন। কেম্ব্রিজ থেকে রবার্ট গেলেন জার্মানীর গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে জার্মান ভাষাটা শিখে নিয়ে 'কোয়ান্টাম থিওরি'র ওপর এক জটিল গবেষণা নিবন্ধ রচনা করলেন। আর তার জন্যই তিনি পেলেন ডক্টরেট ডিগ্রী। ডক্টর ওপেন-হিমার আরও জ্ঞানলাভের জন্য প্রথমে গেলেন জুরিখ এবং তারপর লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯২৮ সাল।

চব্বিশ বছর বয়সে ওপেনহিমার ফিরে এলেন আমেরিকায়। তখন তিনি খ্যাতনামা পদার্থবিদ্ হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। এখানে এসে তিনি প্রথমে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ক্যালি-ফোর্ণিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেক্নোলজির অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন, বিয়ে করলেন এবং শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে জীবন কাটাতে লাগলেন। তাঁর বাসগৃহ হয়ে উঠলো বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান। অধ্যাপনা তাঁর খুব ভাল লাগলো। এ কাজে তাঁর খুব নামও হল।

কিন্তু বেশীদিন এইরকম ভাবে শান্তিতে কাটাতে পারলেন না ওপেন-

হিমার। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের পরামর্শে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট গড়ে তুললেন পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প। আর ১৯৪২ সালে সেই প্রকল্পের পরিচালকের দায়িত্ব নিতে হলো ডক্টর ওপেন-হিমারকে। এরপর মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তিনি তৈরি করে ফেললেন পারমাণবিক বোমা। বিজ্ঞানী সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়ে বোমা তৈরি করলেন। আর রাজনীতিকরা তাঁকে নিয়োগ করলেন ধ্বংসের কাজে। ওপেনহিমার কিন্তু মনে-প্রাণে তা চাননি। তিনি বলেছিলেন—পারমাণবিক শক্তির আছে অফুরন্ত সম্ভাবনা। এই শক্তিকে মানুষের কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করা হলে মানবসমাজ আরও সুখী ও সমৃদ্ধ হবে। আর সেইটাই আমি চাই।

—
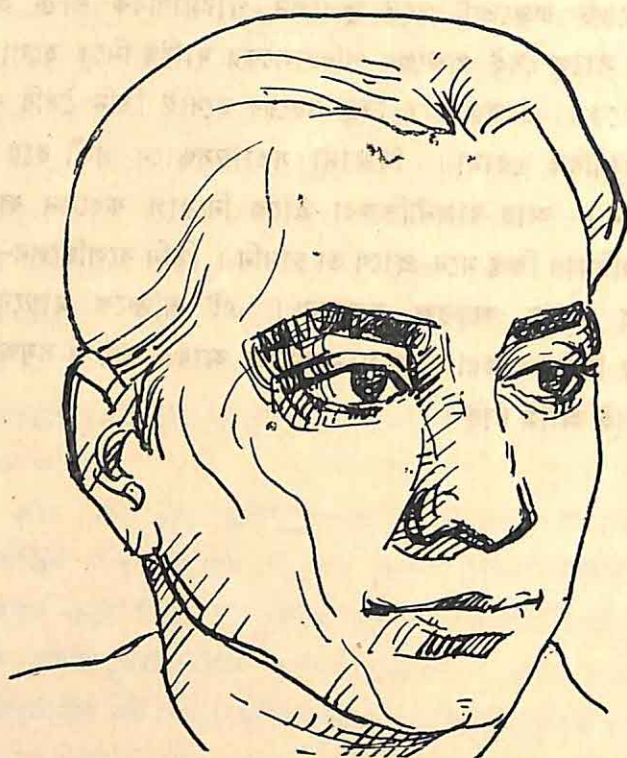
হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

(খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৯-১৯৬৬)

মহাশূন্য থেকে বিভিন্ন মৌলিক কণিকা, বিশেষ করে তড়িতাবিষ্ট কণিকাসমূহ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে এসে পৃথিবীর বুকে অহরহ বর্ষিত হচ্ছে। এই তড়িৎ কণিকার ধারা আসছে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গের আকারে, আর তা আলোকরশ্মির মত ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। এরই নাম 'কসমিক-রে' বা মহাজাগতিক রশ্মি। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার সময় এই রশ্মির অন্তর্গত নিউটন, প্রোটন প্রভৃতি বিভিন্ন কণিকার পরস্পর সংঘাতে 'মেসন' নামে এক নতুন রকম কণিকার সৃষ্টি হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠে যে মহাজাগতিক রশ্মি এসে পৌঁচচ্ছে তার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই এই মেসন কণিকা। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা

আজও এই মহাজাগতিক রশ্মির রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেননি। জগতের সৃষ্টিরহস্যের মূলে এই মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব কতখানি—তা নিয়ে আজও তাঁরা গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর নাম 'ডক্টর হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা'।

ভাবার জন্ম হয় ১৯০৯ সালে বোম্বাইয়ের এক ধনী পার্শি পরিবারে। তাঁর পিতা জে এইচ ভাবা ছিলেন শিল্পপতি আর পিতামত ছিলেন মহীশুর রাজ্যের শিক্ষা-অধিকর্তা।

ভাবার প্রাথমিক পাঠ শুরু হয় বোম্বাই শহরে। বোম্বাই-এর রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে শিক্ষা সমাপনের পর ভাবা মাত্র সতের বছর বয়সে কেম্ব্রিজে যান—ইঞ্জিনীয়ারিং-এ উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য। ১৯৩০ সালে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইপোস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

যুক্তরাজ্যে পড়াশুনা করবার সময় ভাবা কোয়ান্টাম তত্ত্বে গবেষণারত প্রখ্যাত গাণিতিক পদার্থবিদ্‌দের সংস্পর্শে আসেন। তার ফলে তাঁর মনে প্রকৃতির পদার্থগত সমস্যাগুলির গভীরে প্রবেশের আগ্রহ জাগে। ভাবা তাই ইঞ্জিনীয়ারিং ছেড়ে পদার্থবিদ্যায় মনোনিবেশ করেন। তিনি কেম্ব্রিজের 'গনাভিলি' ও 'কেয়াস' কলেজে পড়াশুনা করতে থাকেন। নীল্‌স্ বোর, ম্যাক্সবোর্ণ, ফের্মি, ডিরাক প্রমুখ প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে এসে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করার স্পৃহা জাগে তাঁর মনে। তিনি মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণায় ব্রতী হন। রোমে অধ্যাপক ফের্মির অধীনে ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্সে তিনি এ নিয়ে গবেষণা করেন এবং একটি বৃত্তিও লাভ করেন। তারপর কোপেনহেগেনে 'বোর ইনস্টিটিউটে' কিছুকাল গবেষণা করে অধ্যাপক হাইট্‌লারের সহযোগে 'কাস্কেড থিওরী অফ কসমিক-রে শাওয়ার্স'-এর সূচনা করেন। এই তত্ত্বে তিনি ব্যাখ্যা করেন—কিভাবে মেসন-সৃষ্ট আয়নন বর্ষণ ঘটে। মহাজাগতিক রশ্মিতে যে নতুন ভারী পদার্থকণার অস্তিত্ব নিরূপিত হয়, ডক্টর ভাবা তার নাম দেন 'মেসন'। ১৯৩৫ সালে ভাবা গবেষণার জন্য আইজাক নিউটন বৃত্তি পান। ১৯৩৭ সালে পান 'রয়্যাল একজিবিশন বৃত্তি'। ঐ বছরই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাক্সবর্ণের আমন্ত্রণে ভাবা এডিনবরায় গিয়ে মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এই সময় থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে ভাবা কেম্ব্রিজে

গিয়ে মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ, আণবিক পদার্থবিজ্ঞান ও কোয়াণ্টাম গণিতবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। ১৯৪১ সালে ডক্টর ভাবা ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ১৯৪০ সালে ভাবা ভারতে ফিরে আসেন। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তখন ভাবাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ জানান। ভাবা মহাজাগতিক রশ্মি ও পরমাণু পদার্থবিদ্যার উপর সেখানে যেসব বক্তৃতা দেন তা ভারতের বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। ১৯৪১ সালে ভাবা বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁরই চেষ্টায় স্থাপিত হয় মহাজাগতিক রশ্মি গবেষণাকেন্দ্র। ১৯৪৫ সালে ভাবা বোম্বাইয়ে 'টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ' নামক বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেন। এখানে মহাজাগতিক রশ্মি ও কণিকা পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণার জন্য তিনি বহু সুযোগ্য গবেষক সমবেত করেন।

১৯৪৭ সাল।

ভারত স্বাধীন হলো।

তখন এদেশে পরমাণু শক্তি নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হলো। গঠিত হলো 'পরমাণু শক্তি কমিশন'। ভাবা সেই কমিশনের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হলেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ভাবা ঐ সংস্থার উন্নয়নে তাঁর সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়োগ করেছিলেন। ট্রম্বেতে পরমাণু শক্তি সংস্থার তিনি ছিলেন সর্বময় কর্তা। তাঁরই চেষ্টায় ১৯৬৩ সালে জয়পুরে মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূলতঃ গাণিতিক পদার্থবিদ্ হলেও পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ ক্ষেত্রেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। তাই ভারতে পরমাণু-শক্তির উন্নয়নে তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।

ডক্টর ভাবা ছিলেন সুদক্ষ সংগঠক। মিশুকে মানুষ। সকলের সঙ্গেই তিনি হাসিমুখে মিশতেন। তিনি ছিলেন কলা ও সঙ্গীত-রসিক, ছবি আঁকায় দক্ষ ও সাঁতারে পটু। ভারতীয় নৃত্যেও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। স্থাপত্য বিদ্যায়ও তিনি ছিলেন পারদর্শী। পরমাণু শক্তি জগতের কল্যাণে নিয়োজিত হোক—এই ছিল তাঁর কামনা।

১৯৫৪ সালে ভারত সরকার এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ডক্টর ভাবার অমূল্য জীবনের আকস্মিক অবসান ঘটে। ভারত হারায় তার এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংগঠককে।

—

জোনাস সল্ক

১৯৫৮ সাল।

আমেরিকায় ভোট নেওয়া হলো।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট নয়। এ ভোট একটু অন্য ধরনের। সমসাময়িক আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশী জনপ্রিয় কে, তা নির্ধারণের জন্য ভোট।

ভোটে যিনি জিতলেন, তাঁর নাম 'জোনাস সল্ক'। পোলিও বা শিশুপক্ষাঘাত রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের জন্য জগদ্বাসী ডক্টর সল্কের কাছে চিরঋণী।

পোলিওমাইলাইটিস বা সংক্ষেপে 'পোলিও' মানুষের পরম শত্রু। শৈশবেই মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়। আর আক্রান্ত হলে মানুষ তাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে মারাও যায়। মাঝে মাঝে এই রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিয়ে পঙ্গু করে দিয়ে যায় হাজার হাজার শিশুকে। পোলিও পৃথিবীতে কত শত মানুষকে পঙ্গু করে অভিশপ্ত জীবন যাপনে যে বাধ্য করেছে আর ইয়ত্তা নেই। পোলিও নামক এই মারাত্মক ব্যাধির কবল থেকে রক্ষার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন ডক্টর জোনাস সল্ক।

সল্কের জন্ম হয় ১৯১৪ সালে। তাঁর বাবা ড্যানিয়েল সল্ক এক পোষাক তৈরির কারখানায় ভাল চাকরি করতেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। বাপ ড্যানিয়েল ও মা ডোরা—উভয়েই ছিলেন শিক্ষিত। শিক্ষার প্রতি উভয়েরই অনুরাগ ছিল। কাজেই তাঁদের ছেলেটি উচ্চশিক্ষিত হোক—এটা তাঁরা মনেপ্রাণে চাইতেন।

বাপ-মাকে নিরাশ করেননি জোনাস। লেখাপড়ায় তিনি খুব ভাল ছিলেন। ছিলেন বুদ্ধিমান ও মেধাবী। শৈশবকালেই তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছিল বিশ্লেষণ-স্পৃহা—সব কিছুই পরীক্ষা করে যাচাই করে নেবার বাসনা। জোনাসের বাবা-মা ছেলের প্রতিভার কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের ক্ষমতা অনুসারে ছেলের প্রতিভা বিকাশের সব কিছু সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছিলেন। বিশেষ প্রতিভাধর ছেলেদের জন্য তখন নিউইয়র্কে একটি স্কুল ছিল। স্কুলটির নাম 'টাউনসেণ্ড হ্যারিস হাইস্কুল'। বাবা-মা জোনাসকে সেই স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সেখানে তিনি লেখাপড়ায় খুব ভাল ফল দেখালেন। সেখানকার শিক্ষক মশাইরা বললেন: জোনাস খুব ভাল ছেলে। সে হাতের কাছে, যে বই পায়, সেই বই-ই পড়ে ফেলে। তার মত দক্ষ ছাত্র এ স্কুলে খুব কমই এসেছে।

স্কুলের পাঠ শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য জোনাস ভর্তি হলেন নিউ ইয়র্কের সিটি কলেজে। সেখানে গিয়ে বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ একটা আকর্ষণ অনুভব করলেন তিনি। বিজ্ঞান পড়লেন কলেজে। ১৯৩৪ সালে ঐ কলেজ থেকে বিজ্ঞানের ডিগ্রী লাভ করে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হলেন। ১৯৩৯ সালে সেখান থেকে এম ডি ডিগ্রী লাভ করলেন জোনাস।

ডাক্তারী পাশ করার পর জোনাস সল্ক কিছুদিনের জন্য জীবাণু-তত্ত্ববিদ্ হিসাবে কাজ করলেন। গবেষণার কাজে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। পরীক্ষাগারে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকতে তিনি খুব ভালবাসতেন। ডাক্তারী পড়ার সময় সল্ক দু'জন বিশিষ্ট গবেষকের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁরা হলেন 'ডক্টর মরিস ব্রডি' আর 'ডক্টর ফ্রান্সিস'। ব্রডি পোলিও নিয়ে গবেষণা করতেন আর ফ্রান্সিস গবেষণা করতেন ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে। এঁদের সংস্পর্শে এসে সল্ক গবেষণার কাজে প্রেরণা পান। স্বাধীনভাবে গবেষণার সুযোগও পেয়ে যান ১৯৪২ সালে। ঐ বছর তিনি মিচিগান

বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত হন। সেখানে তাঁকে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা বের করবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। গবেষণা আরম্ভ হলো। কিন্তু শেষ হলো না।

১৯৪৭ সাল।

ডাক এল পিট্‌স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ডক্টর সল্ক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরাস গবেষণাগারের ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করলেন। পোলিওর টিকা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা ইতিমধ্যে কয়েকজন বিজ্ঞানী শুরু করেছিলেন, কিন্তু সুফল পাননি। এখানে এসে ডক্টর সল্কের মনের পরিবর্তন ঘটল। ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের কাজ বন্ধ রেখে তিনি পোলিওর টিকা আবিষ্কারের গবেষণায় মন দিলেন।

এরকম একটা গবেষণার জন্যে প্রচুর সময় ও অর্থের দরকার। কিন্তু এর কোনটাই ছিল না ডক্টর সল্কের। তাই সমস্যার সমাধান হবে না ভেবে তিনি খুব মনমরা হয়ে পড়লেন। কিন্তু ভাল কাজে অর্থের অভাব হয় না—এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। জনসাধারণের অর্থ সাহায্যে পুষ্ট আমেরিকার পোলিও গবেষণাগারের কর্তৃপক্ষ তখন ডক্টর সল্ককে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। সল্ক তখন পুরোদমে পোলিওর প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারের গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন।

ডক্টর সল্ক ও তাঁর সহকর্মীরা পোলিও রোগে আক্রান্ত এক হাজার রোগীর দেহ থেকে পোলিও ভাইরাস সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে তিন শ্রেণীর পোলিও রোগ আছে।

চললো গবেষণা।

দৈনিক ১৬ ঘন্টা করে পরিশ্রম করতেন সল্ক। ছুটির দিনেও তাঁর মন পড়ে থাকতো গবেষণাগারে। কঠোর পরিশ্রমে ডক্টর সল্কের দেহ ক্লান্ত কিন্তু মনে অদম্য উৎসাহ।

অবশেষে ক্লান্তির অবসান ঘটলো। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন ডক্টর সল্ক। পোলিও রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কারে সক্ষম হলেন। জন্তু-জানোয়ারের ওপর ঐ প্রতিষেধক প্রয়োগ করে তিনি সফলতা অর্জন করলেন, কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেল—মানুষের ওপর এটি প্রয়োগ করলেও কি সফলতা অর্জন করা যাবে?

হ্যাঁ, তা গেল।

১৯৫৩ সালে ডক্টর সল্ক নিজে ও নিজের পরিবারের সবাই পোলিওর টিকা নিলেন। টিকা নেওয়ার পর কোন খারাপ উপসর্গ দেখা দিল না। তখন তিনি মনে জোর পেলেন। তারপর পাঁচ হাজার শিশুকে ঐ টিকা দেওয়া হলো। তাতেও সুফল পাওয়া গেল। তখন প্রমাণিত হলো যে, ডক্টর সল্কের আবিষ্কৃত পোলিওর প্রতিষেধক টিকা সত্যিই অব্যর্থ।

ডক্টর সল্ক তাঁর এই বিরাট আবিষ্কারের লভ্যাংশ নিজে গ্রহণ করলেন না। বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন তিনি তাঁর আবিষ্কারের বিষয়বস্তু ও প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুত প্রণালী। তাঁর নিঃস্বার্থ দানে পৃথিবীর মানুষ রক্ষা পেলো সর্বনাশা পোলিও রোগের হাত থেকে।

—